The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXX, pp 259-319, ISSN 2306-3920

বাংলাদেশের তৃতীয় চলচ্চিত্র চর্চা : সঙ্কট ও সম্ভাবনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

সালমা আহ্‌মেদ*

[**সার-সংক্ষেপ:** ১৯৬০-৭০ সালের লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে ঔপনিবেশিক ও স্বৈরাচারী শাসন এর বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে গণজাগরণ দেখা যায়। আর্জেন্টিনা, চিলি, ব্রাজিল, কিউবাসহ লাতিন আমেরিকার নানা দেশে চলছিল তখন মুক্তির সংগ্রাম। জনগণ যখন দেশীয় লুটেরা আর সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার তখন লেখক, শিল্পী, শিক্ষার্থীসহ এবং আপামর মানুষের উপর নেমে আসে সীমাহীন অত্যাচার আর নিপীড়ন। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর পুতুল সরকার আর ধনতান্ত্রিক নয়া বুর্জোয়া সরকারগুলোর বিরুদ্ধে সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক কর্মীদের মতো শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মীরাও তাদের শিল্পকে সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে জনগণের কাছে স্বাধীনতা ও মুক্তির বানী পৌঁছে দিতে রাজনৈতিকভাবে সংকল্পবদ্ধ হয়। চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যমগুলোর মধ্যে অনেক বেশী শক্তিশালী ও প্রভাব বিস্তারকারী। সেই ধারাবাহিকতায় আর্জেন্টাইন চলচ্চিত্রকার ফারনান্দো সোলানাস এবং অক্টিভিও গেটিনো ১৯৬৯ সালে OSPAAAL (Organization of Solidarity with the People of Asia, Africa and Latin America) এর সংগঠন Grupo Cine Liberación এর মুখপাত্র Tricontinental নামক সিনেমা জার্নালে 'Toward a Third Cinema' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যেখানে প্রথম 'তৃতীয় চলচ্চিত্র' প্রত্যয়টি স্পষ্ট করে ব্যাখা করা হয়। শোষণ মুক্ত চেতনা এবং নতুন সমাজ বাস্তবতা সৃষ্টির জন্য এই ধরণের ছবিগুলো চলচ্চিত্রে নতুন ও প্রতিবাদী ভাষা নির্মাণ করবে, যার নাম হবে 'তৃতীয় চলচ্চিত্র'। তৃতীয় চলচ্চিত্রের প্রবক্তারা হলিউডের মুনাফামুখী সিনেমাকে 'ফার্স্ট সিনেমা', ইউরোপীয় অর্থ নির্ভর অভিজাত বুদ্ধিবৃত্তিক সিনেমাকে 'সেকেন্ড সিনেমা' এবং তৃতীয় বিশ্বের বিপ্লবী ও রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকে 'থার্ড সিনেমা' বলে উল্লেখ করেন। বাংলায় 'তৃতীয় চলচ্চিত্রের পথে' শিরোনামের এই প্রবন্ধ কালক্রমে লাতিন আমেরিকাসহ আফ্রিকা ও এশিয়ার তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রকর্মী, নির্মাতা, কলা-কুশলীদের কাছে তৃতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি রাজনৈতিক ও বিপ্লবী ইশতেহারে পরিণত হয়। ১৯৭১ সালের পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অত্যাচার, গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকাররা তৃতীয় চলচ্চিত্রের ধারায় চলচ্চিত্র নির্মাণে নিয়োজিত হন। এরপর আশির দশকের সামরিক স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে তরুণ নির্মাতারা চলচ্চিত্রে গণমানুষের জীবন, রাজনীতি ও সংগ্রামকে প্রাধান্য দিয়ে চলচ্চিত্র আন্দোলন শুরু করেন। তৎকালীন বাস্তবতায়, তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারায় এই নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহ স্বৈরাচারী সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে একটি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পক্ষে জনগণের মাঝে রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টিতে ভূমিকা তৈরি করে। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে তৃতীয় চলচ্চিত্রের এই বিপ্লবী ধারার আলোকে বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য ও মুক্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের সার্বজনীন প্রচেষ্টা, সীমাবদ্ধতা, সংকট ও সম্ভাবনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যথার্থ গবেষণার মাধ্যমে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে।]

* **সালমা আহ্‌মেদ :** সহকারী অধ্যাপক, জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ক. গবেষণার পটভূমি :

১.১ গবেষণার সমস্যার বিবরণ : ভূমিকা :

সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থান গ্রহণে মানুষকে আগ্রহী করে তোলা সমাজের স্বার্থেই জরুরী। এ ক্ষেত্রে শিল্পকলার প্রতিটি শাখাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। রুশ কবি মায়াকোভস্কি যেমন বলেছিলেন, "শিল্পকলায় মানুষের ঐতিহাসিক সংগ্রামের বিবরণই শুধু প্রতিফলিত হয় না, শিল্পকলা মানুষের সংগ্রামে একটি হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করে।" আর রুশ বিপ্লবের পর বিপ্লবী চেতনা সমুন্নত রাখতে লেনিন সেই সময়ের সাংস্কৃতিক কমিশার লুনাচারস্কিকে বলেছিলেন সব ধরনের আর্টের মধ্যে চলচ্চিত্রই তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার ব্যাপারে চলচ্চিত্রের সক্ষমতা লেনিন অনুধাবন করেছিলেন সঠিকভাবে (https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/28717)।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই দক্ষিণ আমেরিকাসহ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে ফ্যাসিবাদ ও ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে জনগণ সোচ্চার হয়ে ওঠে। দেশে দেশে শুরু হয় অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিরোধ। এমতাবস্থায় মুক্তির নেশায় উন্মত্ত জনগণ স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী কৌশলে তাদের মতাদর্শ অনুসারী পুতুল সরকার গঠন করে, তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে (আপাত অর্থে) স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে থাকে অনেক দেশে। ভৌগলিক ভাবে এসব দেশ স্বাধীন হলেও, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে এরা পরাধীন থেকে যায় আর মূল ক্ষমতা থাকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের হাতে। ফলে, সাধারণ মেহনতি মানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি অর্জিত হয়না। দারিদ্রতা, অশিক্ষা, বেকারত্ব, বঞ্চনা সর্বস্তরে থেকেই যায়। প্রতিবাদ করতে গেলে সুবিধাবাদি দালাল শাসকদের হাতেই নির্যাতন আর অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয়, স্বাধীন দেশের আপন মাটিতে। অনেক ক্ষেত্রে দমন পীড়ন কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে ক্ষমতায় বসানো হয় সামরিক বাহিনীর শাসকদের। সত্তর দশকে তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্র শাসিত হতো সামরিক সরকারদের দ্বারা, যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মার্কিন সমর্থিত সাম্রাজ্যবাদীদের মদদপুষ্ট। সামরিক সরকারগুলো সুশৃঙ্খলতার নামে সামরিক শাসন বা মার্শাল ল' জারি করে জনগণের উপর নৃশংস নিপীড়ন চালাতো, যাতে জনগণ একেবারে বিপর্যস্ত আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গণতন্ত্র ও মত প্রকাশের পরিবেশ ছিন্ন করে কঠোর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার মূল উদ্দেশ্য থাকে সুবিধাবাদী, পুঁজিবাদী আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্ষমতায়নকে আরও বেশী সুসংগঠিত করে তোলা।

এমন অবস্থায় স্বাভাবিক কারণে দেশের প্রগতিশীল ও চিন্তাশীল সম্প্রদায় সামরিক বাহিনীর রোষানলে পড়েন। প্রতিবাদী লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, শিক্ষক, ছাত্র, মিডিয়া

ও স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা তথা প্রগতিশীল মুক্তিকামী মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপর নেমে আসে জেল, হত্যা, গুম, ধর্ষণ, গণগ্রেফতার, নির্বাসন আর বন্দীত্ব। এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকা মহাদেশের তৃতীয় ও ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে তখন এটাই ছিল নিত্যকার বাস্তবতা। আর তাই, জনগণের সত্যিকার মুক্তির জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসিবাদী আর ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সুসংবদ্ধ হয় লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, চিত্রনির্মাতাসহ সামগ্রিক মুক্তিকামী রাজনৈতিক কর্মীরা। তারা চলচ্চিত্রসহ শিল্পের সকল মাধ্যমকে সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসেবে অনেক বেশি গণসম্পৃক্ত করার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, তথাকথিত সুবিধাবাদী দালাল সরকারের মায়াজাল থেকে জনগণকে মুক্তি দিতে হলে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সংগ্রামের পাশাপাশি সাংস্কৃতিকভাবে জনগণকে মুক্তি দিতে হবে। ফলে, পুঁজিবাদী, ভোগবাদী আর ধ্রুপদী সংস্কৃতির বিপরীতে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ফ্রন্টে তাঁরা সত্যিকার ইতিহাস জ্ঞান, শিক্ষা ও মান উন্নয়ন সম্পৃক্ত নতুন শিল্প নির্মাণের প্রত্যয় ও শপথ ব্যক্ত করলেন- যা হবে একান্তভাবে তৃতীয় একটি ভাবনা। এ বিষয়ে তৃতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম সক্রিয় তাত্ত্বিক ফারনান্দো সোলানাস ও অক্টাভিও গেটিনো বলেন-

> "জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা নিয়ে এক তুমুল বিতর্ক বিশ্বব্যাপী শিল্পকলার ভুবনকে আরো শোচনীয় করে তুলছে। এই বিতর্ক দু'টো মেরুতে অনুষ্ঠানরত এবং দোদুল্যমান। এক মেরুতে বুদ্ধিজীবীদের সামর্থ্য বা যোগ্যতার বলি দেওয়া হচ্ছে এমন একটি 'বিশেষ' রাজনৈতিক বা সামরিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের যুপকাষ্ঠে যেখানে কোন শিল্প-দর্শনই স্বীকৃত নয়। অস্বীকৃতির অজুহাত এই যে, ওসব শৈল্পিক কাণ্ড-কারখানা একদিন না একদিন অপরিহার্য নিয়মে 'সিস্টেমে'র অধীন তো হয়েই পড়বে। অপর মেরুতে রয়েছে বুদ্ধিজীবীর দ্বৈত চরিত্র। এর এক প্রান্তে শিল্পকলা শুধুমাত্র শিল্পকলা। 'শিল্পকর্ম', 'সৌন্দর্য্যের অধিকার', এ জাতীয় বুলি কপচানো। বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে শিল্প ও সৌন্দর্যানুভূতি সম্পৃক্ত হতে পারে না, এমন একটি মনোভাব। অপর প্রান্তে, রাজনৈতিক বিশ্বাস শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কতিপয় ম্যানিফেস্টো রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আসলে, বুদ্ধিজীবীদের এই শেষোক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটিই রাজনীতি ও শিল্পকলার পৃথকীকরণ কাজটি সম্পন্ন করেছে (গেটিনো ও সোলানাস, ১৯৬৯)।"

লাতিন আমেরিকার প্রতিটি দেশের শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীদের বড় একটি অংশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুললো। চিলি, বলিভিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু ইত্যাদি দেশের চলচ্চিত্রকাররা শিল্পকে হাতিয়ার বানিয়ে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই নতুন ধারায় চলচ্চিত্র নির্মাণে।

তাদের বিপ্লবী প্রয়াসে বিশ্ব চলচ্চিত্র ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক সংযোজন ‘তৃতীয় চলচ্চিত্র’ ধারা ।

‘তৃতীয় চলচ্চিত্র’ ধারণার বিশ্লেষণে বোঝানো হয়, হলিউডের বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের প্রধান বিবেচ্য আর্থিক সাফল্য এবং সেই সাথে পশ্চিমা ভোগবাদী ও পুঁজিবাদী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে বিশ্বব্যাপী আধিপত্যতার সাথে বিস্তৃত করা। ফলে, একে ‘প্রথম সিনেমা’ হিসেবে পরিগণিত করা হয় পৃথিবীজুড়ে। এর বিপরীতে রয়েছে উঁচু শিল্পমান ও নান্দনিকতা সর্বস্ব আভাঁগার্দ ও ইউরোপীয় আর্ট সিনেমা, যা ‘দ্বিতীয় সিনেমা’র প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম ও দ্বিতীয় সিনেমার বড় দূরত্বে থাকা ‘তৃতীয় সিনেমা’র মাধ্যমে প্রকাশ ঘটে অপেক্ষাকৃত নিরীক্ষাধর্মী ও প্রতিবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শের। তৃতীয় সিনেমা বলতে তৃতীয় বিশ্বের সিনেমা - তা কিন্তু বোঝায় না। এটি মূলত রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ। এই তৃতীয় চলচ্চিত্রের নেতৃত্ব দেন লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী ধারার চলচ্চিত্রকার দলের প্রধান সদস্যেরা। যথা, ফারনান্দো সোলানাস, অক্টাভিও গেটিনো, গেরার্দো ভেলিসো, জর্জ সাঞ্জিনিস, জুলিয় গার্সে এস্পিনোজা এবং আরও অনেকে। এরা বিভিন্ন নিবন্ধে, সাক্ষাৎকার ও বিতর্কে ক্লান্তিহীনভাবে তৃতীয় চলচ্চিত্র, বিপ্লবী ও রাজনৈতিক চলচ্চিত্র বিষয়ে আলোচনা ও ব্যাখা করেছেন যেগুলো পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশে মূলধারার চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে তৃতীয় সিনেমার চর্চা করেছেন পথিকৃৎ চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান ও চলচ্চিত্রাচার্য আলমগীর কবির, যাঁদের দুজনই ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। পরবর্তীতে আলমগীর কবির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী, শেখ নিয়ামত আলী, মশিহউদ্দীন শাকেরসহ প্রমুখ নির্মাতারা মূলধারার পাশাপাশি বিকল্পধারা ও স্বাধীন চলচ্চিত্রকাররা কাঠামো ও শৈলী নিয়ে শুরু করেন নানা ধরণের নিরীক্ষা। এর মূলে ছিল চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন ও চলচ্চিত্রের পঠন-পাঠন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি নাম মোরশেদুল ইসলাম, তানভীর মোকাম্মেল এবং তারেক মাসুদ। মোরশেদুল ইসলামের ‘*আগামী*’, ‘*সূচনা*’ ও ‘*চাকা*’ এবং তানভীর মোকাম্মেলের ‘*হুলিয়া*’, ‘*নদীর নাম মধুমতি*’ ও ‘*চিত্রা নদীর পাড়ে*’ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, যেগুলোর মধ্যে তৃতীয় চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এছাড়া নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্রকারদের নির্মাণের মধ্যে তৃতীয় চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যা সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত না হলেও গণমানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থান উপস্থাপিত হয়েছে শক্ত হাতেই। থার্ড সিনেমার উদ্ভব, বিকাশ ও চারণ একটি বিশেষ সময়ে হলেও এটি মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যায়নি বা এর মৃত্যু ঘটেনি বরং এই চলচ্চিত্র রীতি বেঁচে আছে এর আদর্শিক নির্মাণশৈলীর মাধ্যমে। তাই তৃতীয় বিশ্বের মানুষ কিংবা সেখান থেকে প্রথম বিশ্বে পরদেশী-পরবাসী হওয়া তাদের সহযোদ্ধারা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে আজো বেছে নেয় ‘তৃতীয় সিনেমা’ নির্মাণের কাজ।

আলোচ্য গবেষণায় বিশ্ব চলচ্চিত্রে তৃতীয় চলচ্চিত্র চর্চার ধারাবাহিকতায় 'বাংলাদেশের তৃতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্কট ও সম্ভাবনা: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.২ *গবেষণার সার সংক্ষেপ- ঐতিহাসিক পটভূমি :*

আজ থেকে প্রায় ১২৩ বছর আগে (২৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৫) প্যারিসের হোটেল ডি ক্যাফেতে অগাস্ট লুমিয়ের ও লুই লুমিয়ের নামে দুই ভাই চলচ্চিত্রের প্রথম সার্থক প্রদর্শনী করেন। বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণার পর ছায়াচিত্র, ম্যাজিক ল্যানটার্ন আর ফটোগ্রাফিক প্রযুক্তির হাত ধরে চলমান চিত্রের এই নব প্রযুক্তি বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করলো। চলচ্চিত্রের বিকাশের প্রথম যুগ থেকেই চলচ্চিত্র সারা পৃথিবীতে বিনোদনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। চলচ্চিত্রের এই আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার মুলে ছিল, যান্ত্রিক ব্যবস্থায় রুপালী পর্দায় বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি নির্মাণ। বিখ্যাত শিল্প তাত্ত্বিক ওয়াল্টার বেঞ্জামিন এর ভাষায় চলচ্চিত্র হল, *"Mechanical reproduction of Reality"*। ইউরোপ এবং আমেরিকার চলচ্চিত্রকারদের নিরলস প্রচেষ্টায় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তরুণ আবিষ্কার 'চলচ্চিত্র' কখনো বিনোদনমাধ্যম, শিল্প মাধ্যম, গণমাধ্যম, কিংবা প্রতিবাদের ভাষা হয়ে পৃথিবীর সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানা স্তরে ভূমিকা রেখে চলেছে। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে, সাধারণভাবে দর্শক চাহিদার কথা মাথায় রেখে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নির্মিত চলচ্চিত্রকে 'প্রথম চলচ্চিত্র' হিসেবে ব্যাখা করা হয়েছে। আর 'দ্বিতীয় সিনেমা' বলতে বোঝানো হলো শিল্প ও নান্দনিক গুনে সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র সমূহ যা ইউরোপসহ নানা দেশের আর্ট হাউস গুলো থেকে বিশ্বের শিল্পরসিক দর্শকদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত হয়। কিন্তু গত শতকের ষাট দশকে লাতিন আমেরিকার তরুণ চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকেরা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি নতুন ধারার সন্নিবেশ ঘটালেন, আর তা হলো 'তৃতীয় চলচ্চিত্র'। এই 'তৃতীয় চলচ্চিত্র' প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চলচ্চিত্রের আঙ্গিক, ভাষা এবং বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের নিষ্ক্রিয় দর্শক অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে। এই 'তৃতীয় চলচ্চিত্র' ধারার উদ্দেশ্য হলো- বিপ্লবী মূল্যবোধ, রাজনীতি আর প্রতিবাদী চলচ্চিত্রের আবহে দর্শককেও চলচ্চিত্রের সাথে মতাদর্শিকভাবে সম্পৃক্ত করা।

লাতিন আমেরিকা থেকে প্রস্তাবিত এই তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারা ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র অঙ্গণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মূলত সাম্রাজ্যবাদ, শোষণ আর সামরিক শোষণ নিপীড়নে বিধ্বস্ত দেশ গুলোতে গণমানুষকে রাজনৈতিকভাবে সংজ্ঘটিত ও সচেতন করে তোলার নিমিত্তে দেশে দেশে 'তৃতীয় চলচ্চিত্র' ধারায় নির্মাতারা চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহী হয়ে পড়ে। আমাদের দেশের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বাঙ্গালীদের উপর নৃশংস গণহত্যার কথা পৃথিবীর সামনে উন্মোচন করেন চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান। তাঁর সাথে ছিলেন যুদ্ধ

পরবর্তী সময়ের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির। তাঁদের নির্মিত চলচ্চিত্র তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারার প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কিছু বিচ্ছিন্ন চলচ্চিত্র ব্যতিত একটি নতুন সমাজ গঠনে এই ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের গতি লক্ষ্য করা যায় না। অথচ, তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারার প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা পাঠ করলে, বোঝা যায় তৎকালীন সময় থেকে বাংলাদেশে 'তৃতীয় চলচ্চিত্র' ধারায় চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি সুস্পষ্ট সম্ভাবনা দেখা গেলেও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র নির্মাতারা সমাজ সচেতন, রাজনৈতিক বা গঠনমূলক খুব বেশি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পারেনি।

এরই প্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশের তৃতীয় চলচ্চিত্র চর্চা : সঙ্কট ও সম্ভাবনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' বিষয়ে একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরার নিমিত্তে আমার এই গবেষণা সমস্যার উদ্ভব। যেহেতু এই বিষয়ে আর কোন গবেষণা কর্ম ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়নি, ফলে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত এবং ঐতিহাসিক দলিল পর্যালোচনার মাধ্যমে বর্তমান গবেষণার বিষয় 'বাংলাদেশের তৃতীয় চলচ্চিত্র চর্চা : সঙ্কট ও সম্ভাবনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' নির্বাচন করা হয়েছে। এমনকি তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারা সম্পর্কে আমাদের দেশের দর্শকের পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় এই গবেষণায় *'বিশ্ব চলচ্চিত্রে তৃতীয় চলচ্চিত্রের সংজ্ঞা, প্রেক্ষাপট ও বিকাশ'* শীর্ষক আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ব চলচ্চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ এই 'তৃতীয় চলচ্চিত্র' সম্পর্কে ঐতিহাসিক ধারণা ব্যাখা করা হয়েছে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক চর্চার মাধ্যমে আমি প্রস্তাবিত সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান বা ফলাফল প্রাপ্ত না হলেও, একটি সার্বিক চিত্র অনুসন্ধানী এই গবেষণার মাধ্যমে উঠে এসেছে বলে আমার আশাবাদ।

১.৩ *গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :*

কোন গবেষণাকর্ম উদ্দেশ্য ছাড়া একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে না। উদ্দেশ্য ছাড়া গবেষণা কর্ম সাবলীল গতি হারিয়ে ফেলে। প্রতিটি গবেষণা কর্মের অন্তর্নিহিত প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের মাঝেই গবেষণার সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে।

সাধারণভাবে মানুষ তাদের জীবনের গল্প, কাহিনী বা স্বপ্নকে পর্দায় বাস্তবের মতো চলমান দেখে তা বিশ্বাস করতে চায়। ধর্ম, জাতি, শ্রেণী নির্বিশেষে দর্শক চলচ্চিত্রের পর্দায় দৃশ্যমান বাস্তবতার প্রেমে পড়ে, চরিত্রদের মতো ভাবতে চায়, এমন কি জীবনও সাজাতে চায়। তাই পর্দায় উঠে আসে মানুষের সমাজ বাস্তবতার একটি প্রতিরূপ। চলচ্চিত্র শৈল্পিক বা বাণিজ্যিক যে ধারায় নির্মিত হোক না কেনো তা কোনভাবেই সামাজিক আচরণ, দর্শন বা প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা করতে পারে না। আলোচ্যে গবেষণায় 'প্রথম চলচ্চিত্র' এবং 'দ্বিতীয় চলচ্চিত্র'র একটি তুলনামূলক চরিত্রের ধারণা দেয়া হয়েছে, যেখানে দর্শককে এই গল্প, স্বপ্নের মায়াজালে একটি কাল্পনিক জগতে ভুলিয়ে রাখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব পদ্ধতিতে প্রেম, সুন্দরী নারী, অর্থ, সম্পদ

ম্যাজিক ইত্যাদির মোহে সুপরিকল্পিতভাবে জনগণকে ভোগবাদ সর্বস্ব পুঁজিবাদী মানসিকতায় সমৃদ্ধ করা হয়। এমতাবস্থায়, তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারা কিভাবে জনগণকে সঠিক ও যথার্থ পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা অনুধাবনে ভূমিকা রাখে বা রেখেছে তার একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে আমি নির্বাচিত চলচ্চিত্র পর্যবেক্ষণ, তাত্ত্বিক পাঠ ও বিশ্লেষণ করে আমার গবেষণা কর্মটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করি, যা নিম্নে দেয়া হলো -

১. লাতিন আমেরিকার তৃতীয় চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও বিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও কারণ বিশ্লেষণ ।

২. সমসাময়িক বিশ্ব চলচ্চিত্রে আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব এবং মূল্যায়ণ বিচার।

৩. বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ও তৎকালীন জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ।

৪. বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে যুদ্ধোত্তর, যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারায় নির্মাণ প্রয়াস।

৫. বাংলাদেশের সমকালীন বাস্তবতায় তৃতীয় ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের সংকট ও সম্ভাবনার চিত্র।

৬. এছাড়া বর্তমান বিশ্বের নানা দেশে আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাণে 'তৃতীয় চলচ্চিত্রে'র প্রভাবের একটি তুলনামূলক চিত্র অন্বেষণ।

১.৪ গবেষণার গুরুত্ব:

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর নানা দেশে চলচ্চিত্র তার পূর্বের ঐতিহ্য হারিয়েছে। এমনকি একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান সময়ে এসে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট টিভি ও আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসী প্রভাবের কারণে অনেকের ধারণা ছিল, ধীরে ধীরে চলচ্চিত্র মাধ্যমটির বিলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তা একেবারে নিঃশেষ না হয়ে বরং নানা দিক থেকে নতুনভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

উনবিংশ শতকে সাহিত্যকে যেমন সমাজের দর্পণ হিসেবে মনে করা হতো, তেমনি আজকের পৃথিবীর কোন দেশ, জাতি কিংবা আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা বুঝতে গেলে চলচ্চিত্রের প্রয়োজন। একটি জাতি বা দেশের চলচ্চিত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সেই জাতি বা সমাজের একটি প্রতিচ্ছবি থাকে। আমরা জানি, গত শতকের সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ আর উপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য যে তৃতীয় চলচ্চিত্রের বিকাশ ঘটেছে, তার আপাত আবেদন গত শতাব্দীতেই শেষের দিকে এসে হারিয়ে যায়। কিন্তু শোষণ, যুদ্ধ আর নিপীড়নের কালো থাবা এখনো পৃথিবীর বুকে

চলমান। বর্তমান পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ এখন নতুন আদলে ধরা দিচ্ছে। একসময়কার নির্যাতিত তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ অর্থনৈতিকভাবে সাবলীল হয়ে এখন নিজেরাই সামাজিক, অর্থনৈতিকভাবে আগ্রাসী হয়ে উঠছে। আক্রমণ করছে অন্যদেশকে। দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা পরিকল্পিত গৃহযুদ্ধের কারণে দেশান্তরী হচ্ছে লাখ লাখ মানুষ। উপকূলীয় শহরগুলোতে সমুদ্র সৈকত ভরে যাচ্ছে সন্ত্রাস, গণহত্যা আর যুদ্ধের হাত থেকে পালিয়ে আসা মানুষে। এখনো তৃতীয় বিশ্বসহ পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র, জাতি সাম্রাজ্যবাদীদের ছোবল থেকে মুক্ত নয়। মধ্যপ্রাচ্য সহ পৃথিবীর নানা অংশে যুদ্ধ, গণহত্যা, জাতিতাত্ত্বিক নির্যাতন চলছেই। বাংলাদেশ সহ তথা বিশ্বের সেই নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে তৃতীয় চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে এই গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি :

আলোচ্য প্রবন্ধটি একটি পর্যবেক্ষণমূলক কাজ। বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধটিতে গুনগত 'আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি' অনুসরণ করায় এই গবেষণাকর্মটি বর্ণনামূলক (ন্যারেটিভ অ্যানালাইসিস)। গুনগত আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি একজন গবেষক তখনই ব্যবহার করে থাকেন যখন তার টেক্সট আধেয় (কন্টেন্ট)-র অন্তর্নিহিত অর্থের প্রয়োজন হয়। গণমাধ্যম গবেষণার ক্ষেত্রে অনুসৃত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে 'আধেয় পরিচিতি' এবং 'আধেয় বিশ্লেষণ' অন্যতম। উইমার ও ডমিনিক তাঁদের 'ম্যাস মিডিয়া রিসার্চ: অ্যান ইনট্রোডাকশন' গ্রন্থে গণমাধ্যম গবেষণার ক্ষেত্রে আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে জনপ্রিয় কৌশল হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁরা আরো বলেন, 'আধেয় বিশ্লেষণ হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে বিষয়ের ভিতরে থাকা চরিত্রগুলোকে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক ও বস্তু নিরপেক্ষ উপায়ে পর্যালোচনা করা হয়' (উইমার ও ডমিনিক, ২০০৩, ১৪১)।

এরই প্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশের তৃতীয় চলচ্চিত্র চর্চা : সঙ্কট ও সম্ভাবনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' শীর্ষক বর্তমান গবেষণায় দেশি-বিদেশি তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারার নির্মাতা, গবেষক, লেখক, শিল্পী, একাডেমিশিয়ান এবং চলচ্চিত্র কর্মীদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, ইউটিউব, ভিডিও, তথ্যচিত্রে সাক্ষাৎকার, আলোচনা এবং বিবৃতির আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আধেয়তে থাকা বক্তব্যের 'ব্যাখ্যামূলক আধেয় বিশ্লেষণ' পদ্ধতির মাধ্যমে উপর্যুক্ত গবেষণা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে।

'বাংলাদেশের তৃতীয় চলচ্চিত্র চর্চা : সঙ্কট ও সম্ভাবনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' শীর্ষক কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা পূর্বে না হওয়ায় এবং ভবিষৎবাণী করার জন্য পূববর্তী পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় এই গবেষণায় কোন অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis)

দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি বরং কতগুলো গবেষণা প্রশ্নের (Research questions) মাধ্যমে চলচ্চিত্র দর্শন, পাঠ ও বিশ্লেষণ, নির্বাচিত গ্রন্থ, পত্রিকা, জার্নাল, ফিচার, ইন্টারেন্ট এর আধেয় বিশ্লেষণ, সাক্ষাৎকার পাঠ ও দর্শন, নিবিড় পর্যক্ষেণের মাধ্যমে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণাটির চরিত্র একদিকে বর্ণনামূলক, অনুসন্ধানমূলক এবং একই সাথে আধেয়বিশ্লেষণ মূলক। 'বাংলাদেশের তৃতীয় চলচ্চিত্র চর্চা : সঙ্কট ও সম্ভাবনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' শীর্ষক গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপঃ

১. তথ্য সংগ্রহ কৌশলঃ

ক. তৃতীয় চলচ্চিত্র বিষয়ক তত্ত্ব, ইতিহাস, চলচ্চিত্র দর্শন ও পাঠ।

খ. তৃতীয় চলচ্চিত্র বিষয়ক তত্ত্ব, ইতিহাস পাঠ, লিখিত তথ্য উপাত্ত (বই, পত্রিকা, জার্নাল, গবেষণা) সংগ্রহ (literature survey) এবং পর্যালোচনা। এক্ষেত্রে লিখিত মন্তব্য ও বক্তব্যের 'ব্যাখ্যামূলক আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি' (Interpretative Content Analysis) প্রয়োগের মাধ্যমে উপর্যুক্ত গবেষণা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে।

গ. Bangladesh Short Film Forum, Bangldesh Film Society এবং Organization of Solidarity with the People of Asia, Africa and Latin America (OSPAAAL) বা তৎপ্রকার সংগঠন সমূহের কার্যক্রম বিষয়ে যথার্থ পাঠ ও অনুসন্ধান পূর্বক তথ্য যাচাই ও সম্ভাবনার দিক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

ঘ. নিবিড় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই এর মাধ্যমে সম্ভাবনার দিক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে ।

ঙ. দেশি -বিদেশি তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারার নির্মাতা, গবেষক, লেখক, শিল্পী, একাডেমিশিয়ান এবং চলচ্চিত্র কর্মীদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, ইউটিউব, ভিডিও, তথ্যচিত্রে সাক্ষাৎকার, আলোচনা এবং বিবৃতির পাঠ বিশ্লেষণ করে 'মান নির্ধারক আধেয় বিশ্লেষণ' (Normative Content Analysis) পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.গবেষণা এলাকা বর্ণনাঃ

বাংলাদেশের তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারার উপর এই গবেষণা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণার সঠিকতা আনয়নে তৃতীয় চলচ্চিত্র বিষয়ক তত্ত্ব, দেশি - বিদেশি তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারার নির্মাতা, গবেষক, লেখক, শিল্পী, একাডেমিশিয়ান এবং চলচ্চিত্র কর্মীদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, ইউটিউব, ভিডিও, তথ্যচিত্রে সাক্ষাৎকার, আলোচনা এবং বিবৃতি, লিখিত তথ্য উপাত্ত (বই, পত্রিকা, জার্নাল, গবেষণা) উদ্দেশ্যমূলকভাবে সমগ্রক হিসেবে নির্বাচন করে সেখান থেকে নমুনায়ন বাছাই করা হয়েছে।

৩. নমুনায়নঃ

'বাংলাদেশের তৃতীয় চলচ্চিত্র চর্চা : সঙ্কট ও সম্ভাবনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' শীর্ষক বর্তমান গবেষণায় তৃতীয় চলচ্চিত্র বিষয়ক তত্ত্ব, দেশি -বিদেশি তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারার নির্মাতা, গবেষক, লেখক, শিল্পী, একাডেমিশিয়ান এবং চলচ্চিত্র কর্মীদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, ইউটিউব, ভিডিও, তথ্যচিত্রে সাক্ষাৎকার, আলোচনা এবং বিবৃতি, লিখিত তথ্য উপাত্ত (বই, পত্রিকা, জার্নাল, গবেষণা) উদ্দেশ্যমূলকভাবে সমগ্রক হিসেবে নির্বাচন করে সেখান থেকে নমুনায়ন বাছাই করা হয়েছে।

৪. উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ :

বর্তমান গবেষণাটির চরিত্র একদিকে বর্ণনামূলক এবং একই সাথে অনুসন্ধানমূলক হওয়ায় এই বিষয়ক লিখিত মন্তব্য ও বক্তব্যের 'ব্যাখ্যামূলক আধেয় বিশ্লেষণ' (Interpretative Content Analysis) এবং প্রচারিত এবং প্রকাশিত সাক্ষাৎকার-আলোচনা-বিবৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহকে 'মান নির্ধারক আধেয় বিশ্লেষণ' (Normative Content Analysis) পদ্ধতি প্রয়োগ করে উপাত্তের গুণাত্মক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৬ গবেষণার তথ্য সংগ্রহের উপকরণ :

'বাংলাদেশের তৃতীয় চলচ্চিত্র চর্চা : সঙ্কট ও সম্ভাবনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' শীর্ষক এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

১. গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারার নির্মাতা, গবেষক, লেখক, শিল্পী, একাডেমিশিয়ান এবং চলচ্চিত্র কর্মীদের বই, পত্রিকা, গবেষণা গ্রন্থ, জার্নালের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে গবেষণায় বিভিন্ন গ্রন্থাগার, উইকিপিডিয়া, বিভিন্ন ব্যক্তিগত ব্লগ সাইট ব্যবহার করা হয়েছে।

২. গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারার নির্মাতা, গবেষক, লেখক, শিল্পী,একাডেমিশিয়ান এবং চলচ্চিত্র কর্মীদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, ইউটিউব, ভিডিও, তথ্যচিত্রে সাক্ষাৎকার, আলোচনা এবং বিবৃতির পাঠ বিশ্লেষণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে গবেষণায় পত্র–পত্রিকা, টিভি, ইন্টারনেট এবং ইউটিউব ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা নেয়ার জন্য ইন্টারনেট সহ ল্যাপটপ, প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. এছাড়া কাগজ, কলম, পেন্সিল, রাবারও তথ্য সংগ্রহে ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৭ গবেষণার প্রশ্ন:

'বাংলাদেশের তৃতীয় চলচ্চিত্র চর্চা : সঙ্কট ও সম্ভাবনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' শীর্ষক এই গবেষণায় কতগুলো গবেষণা প্রশ্নের (Research questions) মাধ্যমে নির্বাচিত প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্রিকা, গবেষণা, জার্নাল, ফিচার, উইকিপিডিয়া, বিভিন্ন ব্যক্তিগত ব্লগ সাইটের আধেয় বিশ্লেষণ এবং ইউটিউব, ভিডিও, তথ্যচিত্রে সাক্ষাৎকার, আলোচনা এবং বিবৃতির পাঠ বিশ্লেষণ করে নিবিড় পর্যক্ষেণের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় যে সব পথগুলো অনুসন্ধান করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

১. লাতিন আমেরিকার তৃতীয় চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও বিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও কারণ বিশ্লেষণ ।

২. সমসাময়িক বিশ্ব চলচ্চিত্রে আর্থ - সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব এবং মূল্যায়ণ বিচার।

৩. বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ও তৎকালীন জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ।

৪. বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে যুদ্ধোত্তর, যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারায় নির্মাণ প্রয়াস।

৫. বাংলাদেশের সমকালীন বাস্তবতায় তৃতীয় ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের সংকট ও সম্ভাবনার চিত্র।

৬. এছাড়া বর্তমান বিশ্বের নানা দেশে আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাণে 'তৃতীয় চলচ্চিত্রে'র প্রভাব এর একটি তুলনামূলক চিত্র অন্বেষণ।

১.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা:

সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার মাঝে মানব জীবন অতিবাহিত। গবেষণা যেহেতু মানব জীবনের এক অন্যতম অংশ, সেহেতু এটিও যে সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নয়, গবেষক মাত্রই তা স্বীকার করতে হবে। বর্তমান গবেষণায় একই ভাবে কিছু সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে হয়েছে। গবেষণার সীমাবদ্ধতা নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপন করা হলো-

ক. যেহেতু গবেষণার চরিত্র প্রধানত গুণবাচক প্রকৃতির, সেহেতু গবেষণার নমুনায়নের সংখ্যা অনির্দিষ্ট। পরিস্থিতি ভেদে নমুনা হিসেবে নির্বাচিত

নমুনায়ন পরিবর্তন হয়েছে, যা গবেষণার সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা। এতে গবেষকের কর্ম পরিকল্পনায় পরিবর্তন ঘটেছে।

খ. নমুনা হিসাবে নির্বাচিত সাক্ষাৎকার, প্রাপ্ত তথ্য সমূহ, অপর্যাপ্ত গ্রন্থাদি এবং তৃতীয় ধারায় নির্মিত লাতিন আমেরিকান বা বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের অপ্রতুলতা গবেষণার যথার্থতা আনয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় সীমাবদ্ধতা।

গ. সময় স্বল্পতা এবং অর্থাভাবে গবেষণার নমুনার আয়তন বৃহৎ করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে গবেষণার আয়তন ক্ষুদ্র হয়েছে যা গবেষণা কর্মের যথার্থতা আনয়নের ক্ষেত্রে বড় একটি সীমাবদ্ধতা।

ঘ. সময় স্বল্পতার কারনে গবেষণার আধেয় বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচিত তৃতীয় চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রকাশিত বই, গ্রন্থ, গবেষণা, জার্নাল এবং এই বিষয়ক প্রচারিত সাক্ষাৎকারের সংখ্যা বেশি নেয়া সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে গবেষণার আয়তন ক্ষুদ্র হয়েছে যা গবেষণা কর্মের যথার্থতা আনয়নের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় সীমাবদ্ধতা।

খ. বিশ্ব চলচ্চিত্রে তৃতীয় চলচ্চিত্রের সংজ্ঞা, প্রেক্ষাপট ও বিকাশ:

২.১ ***তৃতীয় চলচ্চিত্রের সংজ্ঞা : যে নামে ডাকি তারে!***

তৃতীয় চলচ্চিত্র মূলত দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়া অঞ্চলের তরুণ কিছু প্রতিবাদী চলচ্চিত্রকারদের দ্বারা অনুসৃত নান্দনিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব, যা গত বিংশ শতাব্দীর ষাট এবং সত্তর দশকে সাড়া পৃথিবীর চলচ্চিত্র জগতকে আন্দোলিত করে। এই চলচ্চিত্র ধারা এখনো চলচ্চিত্র নির্মাণের নানা ক্ষেত্রে কালের পরিক্রমায় অনুপ্রেরণা ও প্রভাব রেখে চলেছে। তৃতীয় চলচ্চিত্র পৃথিবীর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে পরিবর্তনের অঙ্গীকার করে। বিশেষ করে, তৃতীয় চলচ্চিত্রের মতবাদ ও চিন্তা প্রক্রিয়া বাস্তবতা ও রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের তথা মুক্তিকামী দেশগুলাতে বিপ্লবী আবহ নির্মাণে ভূমিকা রাখে। এমনকি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রথম বিশ্বের উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, লিঙ্গ বৈষম্য বা শ্রেণী সংগ্রামের সংজ্ঞা গণ মানুষের কাছে উপস্থাপন করে, যার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিকভাবে নিপীড়িত মানুষের মুক্তি আসবে। তৃতীয় চলচ্চিত্রের গুরুত্ব চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসকে অনেক বেশি গণমুখী করেছে। সামাজিক সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে চলচ্চিত্র শুধুমাত্র বিনোদন নির্ভর না হয়ে, শিল্প সম্মত নান্দনিক উৎকর্ষতার বাইরে গিয়ে গণ মানুষকে শিক্ষিত, অধিকার সচেতন ও প্রতিবাদী করে তুলবে। নির্মাতারা তাই হলিউডের বাণিজ্যমুখি চলচ্চিত্র শিল্প বা ইউরোপের শিল্পগুণে সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাণের বিপরীতে সাম্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আর গণমুখী বিপ্লবী তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তৃতীয় চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিকরা বোঝাতে চাইলেন-

> "তৃতীয় বিশ্বের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অভ্যন্তরে তাদের সমমর্মীদের সংগ্রাম বিশ্ব-বিপ্লবের অক্ষরেখা রচনা করেছে। একালের প্রকাণ্ড সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক ভুবনে এই সংগ্রামটিকে স্বীকার করে নেয় যে চলচ্চিত্র-আমাদের মতে সেটিই হচ্ছে 'তৃতীয় চলচ্চিত্র'। এ সংগ্রাম হচ্ছে মুক্তপ্রাণ ব্যক্তিত্বের সৃজনকর্তা। জনগণ থেকেই এ সংগ্রামের সূচনা। সংক্ষেপে, সংস্কৃতির শরীর থেকে উপনিবেশের সত্তাটুকু হরণ করার প্রক্রিয়া। উপনিবেশকৃত দেশের সংস্কৃতি, চলচ্চিত্রও বটে, একটি সামগ্রিক পরনির্ভরশীলতারই বহিঃপ্রকাশ, যার মধ্য থেকে জারিত হয় এমন সব কাঠামো ও মূল্যবোধ যা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে ব্যস্ত (গেটিনো ও সোলানাস, ১৯৬৯)।"

'তৃতীয় চলচ্চিত্র' প্রত্যয়টির উৎপত্তি 'তৃতীয় বিশ্ব' থেকেই, যা পৃথিবীর মানচিত্রে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, শোষিত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বোঝায়। বেশিরভাগ দেশের রয়েছে শক্তিশালী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক শোষণ, নিপীড়ন, উপনিবেশ আর সংঘাতের ইতিহাস, যা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অবকাঠামো নির্মাণ করে দিয়েছে। এই প্রত্যয়টি একইভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ ইতিহাসের প্রথা ও ধারাকে চ্যালেঞ্জ করেছে তাত্ত্বিকভাবেই।

তৃতীয় চলচ্চিত্রের ব্যাখ্যায়, প্রথম বিশ্বের দেশগুলোর বাণিজ্যমুখি চলচ্চিত্র শিল্প থেকে নির্মিত চলচ্চিত্রকে 'প্রথম চলচ্চিত্র' হিসেবে অভিহিত করে। বিশেষ করে হলিউড ধারার চলচ্চিত্র যা বাণিজ্যের পাশাপাশি বুর্জোয়া মূল্যবোধ, ভোগবাদীতা আর সাম্রাজ্যবাদকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সোলানাস ও গেটিনো বলেন-

> "চলচ্চিত্রের যান্ত্রিকতা, অর্থাৎ একটি ছবি দেখানো হবে বড়ো একটি প্রেক্ষালয়ে, ছবিটির একটি নির্দিষ্ট স্থায়িত্বকাল থাকবে এবং ছবির নিটোল চরিত্রগুলোর জন্ম-মৃত্যু ঘটবে ওই রূপালি পর্দাতেই, এগুলো বিভিন্ন প্রযোজনা সংস্থার বাণিজ্যিক স্বার্থকে রক্ষা করে বটে, তবে এগুলো ক্রমে ক্রমে বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষণের আঙ্গিক আত্মস্থ করার পথটিও সুগম করে দেয়। এই আঙ্গিক ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পকলা তথা বুর্জোয়া শিল্পকলার সাথে সম্পৃক্ত। মানুষ এখানে কেবলই নির্জীব এবং ভোগবিলাসী প্রাণীমাত্র। ইতিহাসকে স্বীকৃতি দেয়ার কোন ক্ষমতাই এই মানুষের নেই, থাকতে পারে না। এই মানুষের ভূমিকা শুধু ইতিহাস পাঠ, ইতিহাস ভাবনা, ইতিহাস শ্রবণ এবং ইতিহাসের একটি উপাদান হিসেবে দায়িত্ব পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চোখ ধাঁধানো 'চমক' হচ্ছে বুর্জোয়া চলচ্চিত্রের উৎকৃষ্টতম নিদর্শন। এটাই হা ভাতে দর্শকের পাতে তুলে দেয় ওরা। এই ভূখণ্ড, মানুষের অভিজ্ঞতা, ইতিহাসের গতিধারা, এইসব একটি চিত্রকর্মের ফ্রেমের ভেতর, কিংবা মঞ্চের ছোট পরিধিতে

> নয়ত চলচ্চিত্র পর্দায় আবদ্ধ থাকে। মানুষ এখানে কেবলই আদর্শের 'কনজিউমার' মাত্র, আদর্শের স্রষ্টা নয়। এই ধারণাটাই হচ্ছে বুর্জোয়া দর্শনের ভেল্কিবাজির প্রথম ধাপ এবং উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করার লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ। পরিণতিতে 'মোটিভেশনাল' বিশ্লেষক, সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং মানুষের স্বপ্ন ও 'ফ্রাস্ট্রেশন' সম্পর্কিত অসংখ্য গবেষকরা এমন একটি চলচ্চিত্রপাঠ করতে শুরু করেন এবং এমন এক চলচ্চিত্র-জীবন ও বাস্তবতা সাজান, যা মূলত শাসক শ্রেণি কর্তৃক পরিকল্পিত (গেটিনো ও সোলানাস, ১৯৬৯)।"

প্রথম সিনেমার মুনাফা কেন্দ্রিক আর বাণিজ্যমুখী প্রবণতার কাছে শিল্প ও নান্দনিকতার যখন স্থান হল না, তখন ইউরোপ জুড়ে দেখা দিল নতুন ধারার চলচ্চিত্র আন্দোলন। প্রথম দিক থেকেই এইসব চলচ্চিত্র স্টুডিও সিস্টেমের প্রযোজকদের মুনাফার বেড়াজাল আর নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে স্বাধীনভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণের পথ সুগম করতে চাইলো। ইউরোপ জুড়ে জনপ্রিয়তা পেলো 'অথর তত্ত্ব' (Director as Auteur), যার মধ্যমে নির্মাতা চলচ্চিত্রের সার্বিক নীতি ও নিয়ন্ত্রণের নিরুঙ্কুশ ক্ষমতা পেলেন। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালির পরিচালকেরা এই ধারায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করে উপহার দিতে লাগলো একের পর এক বিখ্যাত সব চলচ্চিত্র।

উপরোক্ত ছবিগুলোকে আমরা 'প্রথম চলচ্চিত্র' বলে ধরে নেব। এই ধরনের ছবির বিকল্প হচ্ছে 'অথর্স সিনেমা', 'এক্সপ্রেশন সিনেমা', 'নুভেল ভাগ' বা 'সিনেমা নোভো'। এগুলোকে রীতিগতভাবে আমরা 'দ্বিতীয় চলচ্চিত্র' হিসেবে আখ্যায়িত করছি। আমরা মনে করি 'দ্বিতীয় চলচ্চিত্রে'র ছবিগুলো আমাদের এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। কারণ, এ ধরণের ছবি নির্মাণের শর্তই হচ্ছে সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদ বিরোধী সকল প্রচেষ্টায় চলচ্চিত্রকারকে অপ্রচলিত ভাষা প্রয়োগ করার স্বাধীনতা দান করা। তবে কথা হচ্ছে, এই প্রচেষ্টাগুলো 'সিস্টেম' অনুমোদিত স্বাধীনতার সীমারেখাকে ছুঁই ছুঁই করেই ক্ষান্ত। গদারের ভাষায় বলতে হয়, 'দ্বিতীয় চলচ্চিত্রে'র স্রষ্টারা হয় 'দুর্গের ভেতর আবদ্ধ'ই থেকে গেছেন চিরকাল নয়ত ওই দুর্গে বন্দি হবার অপেক্ষায় রয়েছেন। আর্জেন্টিনার দুই লক্ষ চলচ্চিত্র দর্শকের জন্যে বাজার খোঁজার চেষ্টা (পরোক্ষ লক্ষ্য হচ্ছে একটি স্বাধীন স্থানীয় প্রযোজনার খরচ উঠিয়ে নেয়া), 'সিস্টেমে'র সমান্তরালে একটি ভিন্নধর্মী শিল্প উৎপাদন রীতি উদ্ভাবনের চেষ্টা (যদিও ছবিগুলো 'সিস্টেম'ই বিতরণ করে আপন ব্যবস্থামতে), চলচ্চিত্রকে বাঁচানোর তাগিদে ভালো ভালো আইন তৈরি করা, কিংবা 'দুষ্ট কর্মকর্তার' পরিবর্তে 'ভালো কর্মকর্তা' নিয়োগ এর কোনটাই বলা বাহুল্য বাস্তবানুগ নয়। অবশ্য নয়া-ঔপনিবেশিক বা ধনতান্ত্রিক সমাজের 'তরুণ, রাগী অংশ' হিসেবে চিহ্নিত হতে পারাটাকে যদি সার্থকতার মানদণ্ড হিসেবে বেছে নেয়া হয়, তবে ভিন্ন কথা (গেটিনো ও সোলানাস, ১৯৬৯)।

সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে মুনাফা কেন্দ্রিক বাণিজ্যমুখী প্রথম সিনেমার বিপরীতে দ্বিতীয় সিনেমা বলতে বোঝাল শিল্প ও নান্দনিক গুনে সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রসমূহ যা ইউরোপসহ নানা দেশের আর্ট হাউস গুলো থেকে বিশ্বের শিল্পরসিক, ইন্টেলেকচুয়াল, বোদ্ধা দর্শকদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত। এসব চলচ্চিত্র, আপাত অর্থে রাজনৈতিক বা জনগণের উদ্বুদ্ধকরণে কোন কার্যত ভূমিকা রাখে না, রাখতে পারে না। তৃতীয় সিনেমার প্রবক্তারা অনেক ক্ষেত্রে এ ধরণের সিনেমাকে পারফেক্ট সিনেমা হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। তাঁরা মনে করেন, চলচ্চিত্র কেবল মাত্র নির্মাণ ও আঙ্গিকের শৈলী দিয়ে নিখুঁতভাবে নির্মিত হলেই তা দর্শকের কাছে প্রদর্শন উপযোগী হবে, এমন ভাবার কিছু নেই। কিউবার চলচ্চিত্র নির্মাতা জুলিও গার্সিয়া এসপিনোজা তাঁর প্রবন্ধে বলেন-

> "Nowadays, perfect cinema — technically and artistically masterful — is almost always reactionary cinema. The major temptation facing Cuban cinema at this time — when it is achieving its objective of becoming a cinema of quality, one which is culturally meaningful within the revolutionary process —is precisely that of transforming itself into a perfectcinema
> (http://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC20folder/ImperfectCinema.html)."

এসপিনোজা মনে করেন, কারিগরি বা নির্মাণের দিকে থেকে যথাযথ নয়, কিন্তু বক্তব্যের দিকে থেকে শক্তিশালী চলচ্চিত্রও অবশ্যই প্রদর্শিত হবার দাবি রাখে, যদি তা সততার সাথে রাজনৈতিকভাবে জনগণের কাছে আবেদন তৈরি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে এসপিনোজো বলেছেন-

> "Imperfect cinema finds a new audience in those who struggle, and it finds its themes in their problems. For imperfect cinema, "lucid" people are the ones who think and feel and exist in a world which they can change. In spite of all the problems and difficulties, they are convinced that they can transform it in a revolutionary way. Imperfect cinema therefore has no need to struggle to create an "audience." On the contrary, it can be said that at present a greater audience exists for this kind of cinema than there are filmmakers able to supply that audience
> (http://www.ejumpcut.org/archive/onlineessys/JC20folder/Imperfect Cinema.html)."

তৃতীয় চলচ্চিত্র তাই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চলচ্চিত্রের আঙ্গিক, ভাষা এবং বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের নিষ্ক্রিয় দর্শক অবস্থানকে নানাভাবে চ্যালেঞ্জ করে। বিপ্লবী মূল্যবোধ আর প্রতিবাদী চলচ্চিত্রের আবহে দর্শককে চলচ্চিত্রের সাথেও মতাদর্শিকভাবে সম্পৃক্ত করে ফেলে।

২.২ *তৃতীয় চলচ্চিত্রের উদেশ্য ও প্রকৃতি:*

নির্মাতাদের উপর ভিত্তি করে তৃতীয় চলচ্চিত্রের বিষয়, আঙ্গিক বা বক্তব্য দেশভেদে ভিন্নতা লাভ করেছিল। সাথে যুক্ত হল প্রয়োজনীয় রিসোর্সের প্রাপ্তি, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো, প্রদর্শনের সুযোগ। যেহেতু তাঁরা বিষয়বস্তু নিরীখে সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিকতন্ত্র বিরোধী, ফলে তাদের গতিবিধি ও অবস্থান অনেক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ থাকতো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের চলচ্চিত্র প্রদর্শন বাধাগ্রস্ত হতো, সরকারী বা সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত লোকদের দ্বারা। এবার দেখা যাক, সাধারনভাবে তৃতীয় চলচ্চিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি-

- প্রধানত, তৃতীয় চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস ও প্রকৃতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। বিশেষত সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশবাদ বা তাঁবেদার সরকারগুলোর প্রতি।
- তৃতীয় চলচ্চিত্র নিপীড়িত জনগণের মুক্তির কথা বলবে, এবং তা লিঙ্গ, শ্রেণী, জাত, ধর্ম বা সম্প্রদায় নিরীখে।
- দেশের মধ্যে স্থানিক বা অস্থানিক যে সমস্ত মানুষ অর্থনৈতিক কারণে, নির্বাসন বা শাস্তি এড়াতে নিজভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে আশ্রয় নিয়েছে তাদের মধ্যে আত্ম-পরিচয় ও সম্প্রদায়গত ভাবনা সৃষ্টি করাও তৃতীয় চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য।
- তৃতীয় চলচ্চিত্র বিদ্যমান ধারণা ও মূল্যবোধকে উন্মুক্ত সংলাপের মাধ্যমে অতীত ও বর্তমানের প্রেক্ষিতে প্রশ্নবিদ্ধ করে, তাদের সমসাময়িক গুরুত্ব ও তাৎপর্য নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে সংখ্যালঘু, আদিবাসী আর দারিদ্র নিপীড়িত এবং নারীর লুকায়িত সংগ্রামকে জনসম্মুখে উপস্থাপন করবে।
- জীবনধারণের দারিদ্রতার অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতির উপর আলোকপাত করে তৃতীয় চলচ্চিত্র দর্শককে দেখায় কিভাবে বাস করতে হবে, শুধুমাত্র বাস করার স্বপ্ন দেখিয়ে নয়।
- বুদ্ধিজীবী ও গণমানুষের সাথে শিক্ষা এবং সংলাপের মাধ্যমে সংযোগ ঘটানো তৃতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য।
- তৃতীয় চলচ্চিত্রের প্রচেষ্টা থাকে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও জনগণের আদর্শকে ব্যবহার করে কিভাবে নতুন নতুন উন্নয়ন, সংস্কার আর সম্ভাবনার পথ সৃষ্টি করা যায়।

তৃতীয় চলচ্চিত্রের নান্দনিকতা ছিল নিত্য নতুন সৃষ্টিশীল চলচ্চিত্র নির্মাণে চলচ্চিত্রের নানা ধরণ (Genre) ও দৃশ্যগত স্টাইলের সন্নিবেশ ঘটিয়ে মুক্তিকামী জনগণের মাঝে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিনির্মাণ করা এবং তা হবে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পসম্মত অভিব্যক্তির (অরাজনৈতিক) বিপরীতে। এভাবে তৃতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতারা নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃশ্য, বিষয় ও কম্পোজিশনের কাঠামো আর বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যবহার করতেন সার্থকভাবে। ফলে, বোঝা যেত তৃতীয় চলচ্চিত্র কেন বিষয়বস্তু, স্টাইল ও আঙ্গিকের দিক থেকে একে অপরের চেয়ে ভিন্ন এবং

নিজস্বতা সম্পন্ন ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা নিউজরীল শর্ট, বাস্তবানুগ চিত্রায়ণ, তথ্যচিত্র, প্রামান্য দৃশ্য অথবা আঁভাগার্দ স্টাইলে জনগণের মাঝে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা ছড়িয়ে দিতেন। শাসকের ক্ষমতার বলয় ও নিপীড়নের বাহ্যিক বা গোপন কৌশল সম্পর্কে ধারণা দিয়ে মুক্তির লক্ষ্যে শোষণ ও সংগ্রামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুলতেন।

সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সমালোচনা ও জনগণের চাওয়া পাওয়ার সাথে এর সম্মিলন ঘটিয়ে সামাজিক সচেতনতার একটি ক্ষেত্র নির্মাণ করে থাকে তৃতীয় চলচ্চিত্র। এছাড়া চলচ্চিত্রের শক্তিকে ব্যবহার করে দেশের বা দেশের বাইরে জাতি ও লিঙ্গের মধ্যে ক্ষমতা, জাতিবোধ, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবদমন সম্পর্কে সার্বিকভাবে অবহিত করে, সজাগ করে তোলে। এমনকি তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোকে সত্যিকার ধারণা দিতে আবেগ বা অতি নাটকীয়তা পরিহার করে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। তৃতীয় চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো ধীরে ধীরে লাতিন আমেরিকার বাইরের অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের চলচ্চিত্রকারদের অনুপ্রানিত ও প্রভাবিত করে। এমনকি উন্নত বিশ্বগুলোতে তৃতীয় বিশ্বজনিত নানা ইস্যুতে সামাজিক পরিবর্তনের বক্তব্য ও জনমত সৃষ্টির জন্য নির্মাতারা তৃতীয় চলচ্চিত্রের আঙ্গিক ও ফর্মকে বেছে নিতে থাকে।

২.৩ *তৃতীয় চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপট:*

বিংশ শতাব্দীর "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ বুঝতে পেরেছিল যে উপনিবেশগুলি থেকে পুরানো কায়দায় অর্থনৈতিক শোষণ চালানো আর লাভজনক নয়, তাই তাদের নতুন রাস্তা খুঁজতে হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে উপনিবেশগুলো ছেড়ে চলে গেলেও তারা তাদের অর্থনৈতিক শোষণের পথ কিন্তু পাকা করেই গিয়েছিল। তাঁবেদার দেশীয় শাসকগোষ্ঠীর কাছে নিরাপদ ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারা একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শোষণের রাস্তা নিষ্কণ্টক রইলো, অন্যদিকে প্রশাসনিক তথা রাজনৈতিক দুশ্চিন্তারও উপশম হল। বিদেশী শোষক শ্রেণীর দালাল, দেশীয় শোষক শ্রেণী এবং তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষাকারী শাসক গোষ্ঠীর মদদে অর্থনীতিক লুণ্ঠন চলল অবাধে, আর এই অর্থনৈতিক লুঠতরাজ অব্যহত রাখতে ঘরে বাইরে নিত্য নতুন কৌশল আবিষ্কৃত হতে থাকল। সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত করার জন্য যেমন নিত্যনতুন পন্থা উদ্ভাবিত হতে থাকল, তেমনি সামাজিক চেতনা আচ্ছন্ন করার জন্য ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার সবকটি ব্যাধি আমদানি করা শুরু হল। মানুষের সমাজজীবনকে দূষিত করে দেওয়ার জন্য, মানুষের মূল্যবোধকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য আশ্রয় নেয়া হল পরিবেশ দূষক মরণ যন্ত্রের। একাজে শোষক শ্রেণীর সবচেয়ে বড় সহায়ক হল সেই সমস্ত শিল্পমাধ্যমগুলি, যেগুলির প্রভাব জন মানুষের গভীরে ক্রিয়াশীল। চলচ্চিত্র মাধ্যমটির ভূমিকা এক্ষেত্রে কল্পনাতীত (প্রেমেন্দ্র, ২০১৪)।"

ষাট দশক থেকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে উপনিবেশ, সাম্রাজ্যবাদ আর মার্কিন সমর্থনপুষ্ট সামরিক শাসিত স্বৈরাচারী সরকার গুলোর বিরুদ্ধে গণমানুষের মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের আদর্শ, কিউবার বিপ্লব, সর্বহারা মানুষের উপর কলোনিয়াল শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে দেশে দেশে প্রগতিশীল, সাম্যবাদী শিল্পী, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকারসহ অনেকেই রাজনৈতিকভাবে সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়েন। তৃতীয় চলচ্চিত্রের নির্মাতারা তাই শুরুর দিকে গেরিলা পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে চলচ্চিত্র ও দর্শককে একীভূত করে আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে চলচ্চিত্রকে জীবন ও রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বিপ্লবী আদর্শের পতন ও সংগ্রামের ধরণ বদলে গেলে তৃতীয় ধারার নির্মাণ একইভাবে ফিকে হয়ে আসতে থাকে। তখন নতুন ভাবনা বা ইস্যুর সন্নিবেশ ঘটিয়ে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তৃতীয় চলচ্চিত্রের বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভ করে। তৃতীয় চলচ্চিত্র তাই শুধু মাত্র সংগ্রাম ও বিপ্লবের নির্দিষ্ট ছকে আবদ্ধ না থেকে রাষ্ট্র গঠনের নানা প্রকল্পে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নানা ষড়যন্ত্র ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা প্রতিহত এবং অক্ষমতা ও অন্তঃসারশূন্য নয়া বুর্জোয়া সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন ও তৎপর করতে কাজ করে গেছে।

২.৪ *তৃতীয় চলচ্চিত্রের ইশতেহার :*

মূলত তৃতীয় চলচ্চিত্রের কাঠামো, আঙ্গিক বা নান্দনিকতার রূপরেখা নিয়ে কোন রাজনৈতিক বা মতবাদজনিত পুস্তক প্রকাশিত হয়নি। এমন না যে, স্টাইল, ধরণ বা আঙ্গিকের উপর সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা প্রচারিত হয়েছে। মার্ক্সবাদ বা লেনিনবাদের উপর ভিত্তি করে যেমন সমাজতন্ত্র বা কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে ওঠে, তেমনি তৃতীয় চলচ্চিত্র কোন একক তত্ত্ব বা গবেষণালব্ধ বিষয় ছিল না, যার জন্য নির্দিষ্ট ছকে নির্মাতারা চলচ্চিত্র নির্মাণে এগিয়ে গেছেন। তবে, এক্ষেত্রে কিছু কিছু সমসাময়িক ধারণা ও তত্ত্ব মূলভাব বা অনুপ্রেরণা তৃতীয় চলচ্চিত্রের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৬১ সালে আলজেরিয়ান বংশোদ্ভূত ফ্রান্সের মনোবিজ্ঞানী ফ্রাঞ্জ ফেননের প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ '*The Wreched of the Earth*' একটি যুগান্তকারী দিক উন্মোচন করে। তিনি কিভাবে সমাজের ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কলোনিগুলো একটি নতুন জাতীয় সচেতনতা নির্মাণ করবে তার দিক নির্দেশনা দেন। ফেনন মুক্তিপ্রাপ্ত দেশের জনগণকে ঔপনিবেশিক (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক) নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হয়ে সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন হবার বিষয়ে পরামর্শ দেন। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় ব্রাজিলের শিক্ষাবিদ ও তাত্ত্বিক পাওলো ফ্রিরের '*Pedagogy of the Opressed* ' গ্রন্থটি, যেখানে তিনি শোষকদের নিয়ন্ত্রিত ও প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে লাতিন আমেরিকাসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশের জনগণকে নিজস্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কেবলমাত্র নিজস্ব বাস্তবতা, ইতিহাসবোধ,

নিজেদের পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ নিপীড়িত মানুষকে বিপ্লবী করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া সার্বিকভাবে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সামগ্রিকভাবে মার্ক্সবাদী বিপ্লবী দর্শনের জনপ্রিয়তার কারণে তৃতীয় চলচ্চিত্রের নির্মাতারা প্রায় সবাই মার্ক্সবাদী দ্বান্দিকতাবাদ আর সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হোন।

কিন্তু সংজ্ঞা ও পদ্ধতি বিশ্লেষণে চারটি সুনির্দিষ্ট প্রবন্ধকে আমরা তৃতীয় চলচ্চিত্রের ইশতেহার বা ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত করতে পারি। ব্রাজিলের চলচ্চিত্রকার গ্লোবার রোশা কর্তৃক '*Aesthetic of Hunger* ' (১৯৬৫), যেখানে দারিদ্রতা, অভাব ও ক্ষুধাকে নান্দনিকতার সাথে উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে, যাতে অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যক্তি তার অভাবকে উপলব্ধি করতে পারেন। কিউবার চলচ্চিত্র নির্মাতা ও চিত্রনাট্যকার জুলিও গার্সিয়া এসপিনোজা তাঁর '*For an Imperfect Cinema* ' (১৯৬৯) প্রবন্ধে বোঝাতে চাইলেন, চলচ্চিত্রের মূল কাজ একটি কারিগরি, নান্দনিক, শিল্পসম্মত দিক থেকে পারফেক্ট বা নিখুঁত চলচ্চিত্র নির্মাণ নয়, বরং তার প্রধান উদ্দেশ্য হবে, জনগণকে তার পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের সম্যক ধারণা দিয়ে পরিবর্তনের জন্য উপযোগী করে তোলা। বলিভিয়ান চলচ্চিত্রকার জর্জ সাঞ্জিনিস তাঁর '*Problems of Form and Content in Revolutionary Cinema* ' (১৯৭৬) প্রবন্ধে নির্মাতাদের বিপ্লবী চলচ্চিত্রের ধরণ কেমন হবে তার আঙ্গিক, বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক মতামত দিলেন। এবং আর্জেন্টাইন চলচ্চিত্রকার ফারনান্দো সোলানাস এবং অক্টাভিউ গেটিনো রচিত '*Toward a Third Cinema* ' (১৯৬৯) প্রবন্ধে তৃতীয় চলচ্চিত্রের নির্মাণ ও প্রদর্শনের ধরণ, বক্তব্য, কৌশল ও আঙ্গিক নিয়ে বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত করে হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, শেষোক্ত সোলানাস এবং গেটিনোর '*Toward a Third Cinema*' প্রবন্ধে তৃতীয় চলচ্চিত্রের রাজনৈতিক ভূমিকা আর অবস্থানের স্পষ্টতার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপের কারণে তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারার ভাবনাকে পৃথিবীব্যাপী আলোচিত ও সমাদৃত করে তোলে।

২.৫ লাতিন আমেরিকার উল্লেখযোগ্য তৃতীয় চলচ্চিত্র ও তার বিশ্বব্যাপী প্রভাব:

> "ষাটের দশক চলচ্চিত্রের একটি সুপ্রোথিত মাইলস্টোন। রাজনীতিতে প্রতিশ্রুত চলচ্চিত্রকাররা এসময় থেকে তাঁদের রাজনৈতিক বক্তব্যকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জোরালোভাবে প্রকাশ করার কাজে নিজেদের নিবেদিত করেন। এবং এভাবেই শুরু হয় রাজনৈতিক ছবির সূচনা পর্ব। ক্রমশঃ তা বিস্তার লাভ করে পৃথিবীর সর্বত্র। প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকাররা তাঁদের রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা এবং আদর্শকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগণের কাছে তুলে ধরতে শুরু করেন (খসরু, ১৯৮০)।"

ইউরোপীয় চলচ্চিত্র আন্দোলনগুলোর নব জোয়ার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এসে লাগে। ব্রাজিলের তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের উদ্যোগে 'সিনেমা নোভো' আন্দোলন শুরু হয়। হলিউডের ধ্রুপদী এবং সমকালীন ইউরোপীয় আর্ট ফিল্মের আবির্ভাবের সাথে এই চলচ্চিত্রকাররাও নতুন চলচ্চিত্র নির্মাণের অঙ্গীকার করেন। বলা যায়, 'সিনেমা নোভো' ৬০ দশকের আধুনিক ধ্রুপদী চলচ্চিত্র এবং তৃতীয় চলচ্চিত্রের যোগসূত্র স্থান। এদের মধ্যে সোচ্চার ছিলেন গ্লোবার রোসা - যাকে 'সিনেমা নোভা' আন্দোলনের প্রধান তাত্ত্বিক ও পুরোধা বলা যায়। অন্যান্যদের মধ্যে নেলসন পেরেইরা দ্য সানতোস, রায় গুয়েরা এবং কার্লোস দিইজু উল্লেখযোগ্য। তাঁদের বেশিরভাগ ছবিতে নাগরিক, শহুরে জীবনের বাইরে প্রান্তিক অঞ্চলের চিত্র ফুটে উঠেছে। *Barravento* (The Turning Wind ১৯৬২) ছবির কাহিনী সমুদ্র তীরবর্তী 'বাহিয়া' অঞ্চলের। রোসা'র পরবর্তী ছবি *Black God, White Devil* (১৯৬৪)। ব্রাজিলের উত্তর-পশ্চিমের রুক্ষ সমতল ভূমির একটি গ্রাম। গ্রামের মানুষেরা ধর্মীয় আধ্যাত্মিক নেতা এবং ডাকাত চক্রের হাতে নিষ্পেষিত ও অবদমিত। ইউরোপের সিনেমার অথর তত্ত্বের প্রভাব সিনেমা নোভোর পরিচালকদের চলচ্চিত্রে স্পষ্ট। ক্যামেরা স্টাইল এবং পরিচালনা, দৃশ্যায়ণ, সম্পাদনা রীতি সব মিলিয়ে সিনেমার প্রচলিত আবেশকে যেন বিঘ্নিত না করে। নেলসন পেরেইরা দ্য সানতোস ভূমিহীন চাষাদের জীবনকে আরো নির্মমভাবে তুলে আনেন '*Vidas Sicas*' (Barren Lives, ১৯৬৩) ছবিতে। সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্র ফিবিয়ানো ১৯৪০ এর দূর্ভিক্ষের সময়ে কাজের খোঁজে তার পরিবারকে নিয়ে উদ্দেশ্যহীন যাত্রা শুরু করে। এদিকে আর্জেন্টিনায় পেরোনিস্ট সরকারপন্থী ফার্দিনান্দো সোলানাস ও অক্টেভিও গেটিনো যৌথ উদ্যোগে তৃতীয় চলচ্চিত্রের ইস্তেহার প্রচারিত হয় এবং তাঁরা নির্মাণ করলেন ল্যাটিন আমেরিকার সংগ্রামী ইতিহাসের সার্থক দলিল '*Hour of the Furnaces*' (১৯৬৮)। চারঘন্টা ব্যাপী তিনপর্বের এই তথ্যচিত্র ধ্রুপদী তথ্যচিত্রের ভাষা, দক্ষতা বা আঙ্গিকের এক অনন্য সংমিশ্রণ।

ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার মতোই চিলির রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের উত্থান ও বিকাশ। ষাট দশকে বন্ধুর সামাজিক-রাজনৈতিক আবহ চলচ্চিত্র কর্মী, ছাত্র ও নির্মাতাদের দারুনভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারে উৎসাহিত করে তোলে। রাউল রুইজ এর '*Tres Tristes Tigres*' (Three Sad Tigers, ১৯৬৮) ছবিটি রাজনীতি বিমূখ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবির করুণ পরিনতি'র গল্প; মিগুয়েল লিত্তিনের '*Jackel of the Nahueltoro*' (১৯৬৯) চলচ্চিত্রে একজন খুনীর জীবনী অনুসন্ধান করে দেখা গেল, তার হত্যার কারণ আসলে তার চারপাশের সামাজিক দূর্দশা ও অবক্ষয়। চিলিতে বামপন্থী সরকার সালভাদোর আলেন্দে খুন হলে সামরিক সরকারের ভয়ে কিউবায় পালিয়ে গিয়ে পরিচালক প্যট্রিসিও গুজমান '*The Battle of Chile*' (১৯৭৩) নামক একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করলেন। চিলিতে আলেন্দের সরকারের সময় ও তার দুর্বলতা, সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল নিয়ে তথ্যচিত্রটি

নির্মিত। প্যারিস এ মিগুয়েল লিত্তিন চিলির সামরিক অভ্যুত্থান বিষয়কে নিয়ে নির্মাণ করলেন '*Promised Land*' (১৯৭৩)।

বাতিস্তা সরকারকে উৎখাত করে ১৯৫৯ সালে কিউবা বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের ক্ষমতায় এলেন বামপন্থী নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রো। লেনিনের মতো কমরেড ক্যাস্ট্রো চলচ্চিত্রকে গুরুত্বপূর্ন শিল্প হিসেবে মনোযোগ দেন। কিউবার নির্মাতা টমাস গুটিরেজ আলেয়া পরিচালিত '*Memories of Underdevelopment*' (১৯৬৮) অনুন্নয়নের অনেকগুলো বিষয়কে তুলে ধরতে চায়। এই চলচ্চিত্রে মূলত বিপ্লব ও পুনর্গঠনকালের প্রেক্ষাপটের প্রতি 'সের্গেই' নামক একজন (আপাত অর্থে সৎ) বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবির জীবন ও চিন্তাভাবনাকে প্রতিফলিত করা হয়। পুঁজিবাদী আদর্শে বিচ্ছিন্নতা ও ভোগবাদী মানসিকতার কারনে প্রেম ও যৌনতা'র মাঝে সে মুক্তি পেতে চায়, কিন্তু তাতেও তার অস্থিরতা কাটতে চায় না। ফলে রাজনীতি, সংস্কৃতি, বিপ্লবী আনন্দে জনগণ, বিশেষত নারীদের রক্ষনশীলতার প্রতি - সের্গেই সমালোচনা ও কটাক্ষ করে যায়। কিউবা'র আরেকটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র '*Lucia*' (১৯৬৮)। হামবার্তো সোলাস - এর এই ছবি বিপ্লব পূর্ববর্তী কিউবার সমাজে নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সংগ্রাম, বিপ্লব সময়ে তাদের নেপথ্য ভূমিকা এবং পরবর্তীতে নারীদের যথার্থ মূল্যায়নের ফলে নারী জাগরণের সাফল্য গাঁথা রচিত হয়।

লাতিন আমেরিকার তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র '*Blood of the Condor*' (১৯৬৯)। বলিভিয়ান চলচ্চিত্রকার জর্জ সাঞ্জিনিস পরিচালিত এই চলচ্চিত্রে চিকিৎসার নামে বলিভিয়ান আদিবাসী নারীদের উপর মার্কিন এক কোম্পানির গোপনে মাদকাসক্ত করার ষড়যন্ত্র দেখানো হয়। এই চলচ্চিত্র নির্মাণের পর বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে পড়লে তা জনগণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় এবং উক্ত কোম্পানিটিকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

লাতিন আমেরিকার পাশাপাশি আফ্রিকা ও এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে তৃতীয় সিনেমার চর্চা। প্রথম প্রজন্মের মৌরিতানীয় চলচ্চিত্রকার মেড হন্ডো আফ্রিকায় থার্ড সিনেমার অন্যতম একজন প্রবক্তা। তিনি ১৯৬৭-তে নির্মাণ করেন *সোলেইল* ও এবং পরে '৭৪-এ *অ্যারাবস অ্যান্ড নিগার্স-ইওর নেবারস* এবং '৯৪-এ *ব্ল্যাক লাইট*। সেনেগালের ওসমান সেম্বেনে নির্মাণ করেন হাল্লা, ব্ল্যাক গার্ল ও মুলাদি, যার মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেন সমসাময়িক রাজনীতির টানাপড়েন, নব্য ঔপনিবেশিকতা আর সামাজিক অবক্ষয়ের খুঁটিনাটি। রাজনৈতিক ও বিপ্লবী চলচ্চিত্রের মধ্যে আরো রয়েছে গিলো পন্টেকর্ভোর '*ব্যাটল অব আলজিয়ার্স* ' (১৯৬৬), ইউসুফ শাহীনের ' *আলেকজান্দ্রিয়া... হোয়াই '(১৯৭৯)* এবং জাঁ মারিয়ে টেনোর '*আফ্রিকা আই উইল ফ্লিস ইউ*' (১৯৯২)। এশিয়ার মধ্যে চীন ও ভারতে তৃতীয় সিনেমার প্রকাশ ঘটে সত্তরের দশকে। চীনে নবধারার সিনেমার সূচনা করেন ঝাং ইমু, চেন কাইগি ও তিয়ান ঝুয়াং ঝুয়াং। এঁদের বলা হতো 'শিল্পের সন্তান'। ষাট-সত্তরের দশকে চীনে সাংস্কৃতিক

বিপ্লবের মাধ্যমে যে ফিল্ম অ্যাকাডেমির গোড়াপত্তন ঘটে তার মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসেন প্রতিভাবান সব চলচ্চিত্রকার। তবে তাঁদের ছবি সন্দিহান করে তোলে চীনা সরকারকে, যদিও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এইসব চলচ্চিত্র ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। কাইগির ইয়েলো আর্থ ছবিটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (http://www.shilpaoshilpi.com/তৃতীয়-সিনেমা-রাজনৈতিক-ও-স/)।

২.৬ *ভারতীয় উপমহাদেশের তৃতীয় ধারার চলচ্চিত্রযাত্রা :*

> "ভারতে তৃতীয় সিনেমার আগমন ঘটে ইন্ডিয়ান প্যারালাল সিনেমা ও ইন্ডিয়ান নিউ ওয়েভের হাত ধরে। ১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেন পথের পাঁচালী, যা পরবর্তী সময়ে ইন্ডিয়ান প্যারালাল সিনেমা নামে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করে। একই বছর মৃণাল সেন নির্মাণ করেন রাতভোর। এর আগে ১৯৫২ সালে যদিও ঋত্বিক ঘটক নাগরিক নির্মাণ করেন, তবে ১৯৫৮ সালে তাঁর নির্মিত অযান্ত্রিক ছবিটি দর্শক ও বোদ্ধাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৬০ সালে সরকারি উদ্যোগে ফিল্ম ফিন্যান্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা হলে ইন্ডাস্ট্রির বাইরে পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে অবাণিজ্যিক সিনেমা নির্মাণের সুযোগ ঘটে, যা নিউ ওয়েভ ইন্ডিয়ান সিনেমা বা নিউ ইন্ডিয়ান সিনেমা নামে পরিচিতি লাভ করে (http://www.shilpaoshilpi.com/ তৃতীয়-সিনেমা-রাজনৈতিক-ও-স/)।"

এদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র বিকাশের সাথে সাথে চলচ্চিত্রে নতুন বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়। নতুন এই ধারাটির নেতৃত্ব দেন চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেন। সত্যজিৎ রায়ের কিছু চলচ্চিত্রে সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর চিত্র উঠে আসলেও নান্দনিক চিত্রায়ণ ও বাস্তববাদী মূল্যবোধের কারণে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় রাজনৈতিক বা প্রতিবাদী কোন ভূমিকা রাখে না। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কেবল সামাজিক দুর্দশার প্রতিচিত্রই প্রক্ষেপিত হয়, কোন সঠিক দিক নির্দেশনা থাকে না। পরিচালক নিজেই তা সচেতনভাবে এড়িয়ে যান। ফলে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র শিল্প অনুসন্ধানী ছাত্র, বুদ্ধিজীবি বা সিনেমাপ্রেমীদের অনুপ্রাণিত করে, যা কালান্তরে দ্বিতীয় চলচ্চিত্র হিসেবে পরিগণিত হয়। তবে এক্ষেত্রে, "সত্যজিৎ রায়ের বহুল আলোচিত '*হীরক রাজার দেশে* '(১৯৮০) ছবিটির কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হলেও সত্তরের দশকে সেখানে মানুষ দেখতে পেয়েছে রাজনৈতিক পীড়ন আর জরুরি অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে নিজ ছবিতে সত্যজিৎ স্যাটায়ারের মাধ্যমে শাসকদের আচরণের অসঙ্গতি ও সমাজে টিকে

থাকা অন্যায় তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। এমন রাজনৈতিক সমালোচনার উদ্দেশ্য ছিল দর্শককে বর্তমান ব্যবস্থার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা (https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/28717) ।

এফএফসির অর্থায়নে ১৯৬৯ সালে মৃণাল সেন নির্মাণ করেন ‘*ভুবনসোম*’ এবং একই বছর মনি কাউল নির্মাণ করেন ‘*উসকি রোটি*’, যার মধ্যে ছিল ফরাসি ন্যুভেল ভাগের অনুপ্রেরণা। এই সিনেমার ভাষা ও সংবেদনশীলতা দুটোই আকৃষ্ট করে দর্শক-বোদ্ধাদের। এই পথরেখা ধরে হিন্দি ভাষায় ইন্ডিয়ান নিউ ওয়েভ সিনেমা নির্মাণে এগিয়ে আসেন এফটিআই গ্র্যাজুয়েট কুমার সাহানি, মনি কাউল, সাঈদ মীর্জা, শ্যাম বেনেগাল ও কেতন মেহতা (http://www.shilpaoshilpi.com/)। কিন্তু এদের চলচ্চিত্রকে জীবনঘনিষ্ঠ বা রাজনৈতিক বলা গেলেও, ঠিক তৃতীয় ধারার বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ কিনা বলা মুশকিল। যদিও মীরা ‘*নায়ারের সালাম বোম্বে*’ (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে বস্তিবাসী সর্বহারা শ্রেণীর একটি প্রত্যক্ষ চিত্রায়ণ উঠে এসেছে। ফলে চলচ্চিত্রটি আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত হয়।

সত্তর দশকের অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট,সংগ্রাম ও বিদ্রোহে ভরা কলকাতা থেকে সত্যজিৎ রায় নিজেকে দূরে রাখতে পারেননি। ধ্রুপদী চলচ্চিত্র নির্মানের ধারণা থেকে তিনি যেন কলকাতার মানুষের কাছে ‘*প্রতিদ্বন্দ্বী*’ (১৯৭০), ‘*সীমাবদ্ধ*’ (১৯৭১) ও ‘*জন অরণ্য*’ (১৯৭৬) এই রাজনৈতিক ট্রিলজি নিয়ে ধরা দেন । আবার মৃণাল সেনের কলকাতা ট্রিলজি অর্থাৎ ‘*ইন্টারভিউ*’ (১৯৭১), ‘*কলকাতা-৭১*’ (১৯৭২) ও ‘*পদাতিক*’ (১৯৭৩) ছবিতে থার্ড সিনেমার জোরালো বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিফলিত হয় এবং ভারতে থার্ড সিনেমার বিকাশে এই ছবিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

আশির দশকে ভারতের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক অবক্ষয়, সীমাহীন দুর্নীতি, নগর কাঠামোর পরিবর্তনে উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে সাধারণ মানুষের ছিটকে পড়া, নক্সালবাড়ি আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও এর প্রভাব এবং সর্বোপরি দেশভাগের ক্ষত সবকিছুই প্রতিবাদী চলচ্চিত্রিক ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এইসব সিনেমায়। এই প্রতিবাদ কখনো প্রকট আবার কখনো বা প্রচ্ছন্ন হয়ে ফুটে উঠেছে (http://www.shilpaoshilpi.com/ তৃতীয়-সিনেমা-রাজনৈতিক-ও-স/)। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র সরাসরি রাজনৈতিক নয়। কারণ তাঁর ছবির নিজস্ব একটি জগত থাকে। সেখানে একই ভারতের দুর্ভাগ্য পীড়িত মানুষের গল্প আছে, আছে সমাজের অবক্ষয়ের কথা, বাংলা নামে একটি দেশের কথা – যা শুধু রাজনৈতিক চক্রান্তের কারণে আজ দুইভাগে বিভক্ত। এর পরিণামে একটি জাতি সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ভাবে যে দুর্ভাগ্য ও দুদর্শার মধ্যে পড়লো তার করুণ আর্তি উঠে আসে ঋত্বিক ঘটকের ‘*মেঘে ঢাকা তারা*’ (১৯৬০), ‘*কোমল গান্ধার*’ (১৯৬১)’ *ও ‘সুর্বণ রেখা*’ (১৯৬২) *চলচ্চিত্রে।*

ছবিতে দেশভাগের ফলে স্থানান্তরিত মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক বিপন্নতার যে চিত্র ফুটে ওঠে তার মধ্যে মিশে আছে থার্ড সিনেমার অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ। ... ... এগুলো আমাদের তৃতীয় সিনেমা সম্পর্কে ফ্রানজ ফ্যাননের আদর্শিক সচেতনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে সাংস্কৃতিক স্মৃতিকাতরতার বিষয়টি মনে করিয়ে দেয় (http://www.shilpaoshilpi.com/তৃতীয়-সিনেমা-রাজনৈতিক-ও-স/)। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিকতা-পরবর্তী সমস্যা-পীড়িত পরিস্থিতিতে চলচ্চিত্রকাররা নিজেদের ছবিতে সমকালীন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন। বর্তমান সময়ের গুরুতর সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমালোচনা কখনও তাঁরা তুলে ধরেছেন সরাসরিভাবে (মৃণাল সেনের *'কলকাতা ৭১'*, *'পদাতিক'*, ঋত্বিক ঘটকের *'যুক্তি, তক্কো আর গপ্পো'*, ওসমান সেমবেনের *'হাল্লা'*); কখনও সমালোচনা করা হয়েছে রূপকের মাধ্যমে (জহির রায়হানের *'জীবন থেকে নেয়া'*, সত্যজিৎ রায়ের *'হীরক রাজার দেশে'*, আবদার রহমান সিসাকোর *'বামাকো'*) ।

২.৭ *সমকালীন ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৃতীয় চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব:*

''...we must discuss, we must invent..''

— Frantz Fanon

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যখন সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র সমূহ নিজেদের সমস্যায় জর্জরিত, তখন তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং শোষিত রাষ্ট্রের জনগণ নিজেদের জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে তীব্র আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। লাতিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকায় সংগ্রামী লোকজন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় মরিয়া হয়ে ওঠে। নিজেদের শাসন আর শোষণ করা কলোনিগুলো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ নতুন কৌশল গ্রহণ করে। তাঁদের জন্য লাভজনক রাষ্ট্রগুলোতে নিজেদের পছন্দের তাঁবেদার বা দালাল সরকার প্রতিষ্ঠিত করে, বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সূচনা করে দেশকে হয় দ্বিখণ্ডিত করে (যেমন ভারতবর্ষ) নতুবা সামরিক জান্তার হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হবার সুযোগ করে দেয়। সর্বক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য থাকে, নিজেদের অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক এবং ভূ-রাজনৈতিক লাভ। ফলে, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর মধ্যে জনগণ তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে পারেনা। স্বাধীনতাপূর্ব বিদেশী শাসকচক্রের হাতে অত্যাচারিত হবার মতোই, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশীয় শাসকদের হাতে দমন, নিপীড়ন আর অবহেলার শিকার হয়। অনেকক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক মানুষ নিজেরা বুঝতে পারে না, কেন, কিভাবে বা কি পরিস্থিতিতে তাকে এই পরাধীন, অসহায় জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। সামাজিক বা রাজনৈতিক অসচেতনার কারণে ঈশ্বরের বা নিয়তির বিধান হিসেবে মেনে নিয়ে জনগণ প্রতিবাদবিমুখ হয়ে পড়ে। আর এই মনোভাব সৃষ্টির জন্য সাম্রাজ্যবাদী

শক্তি শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র তথা শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের উপর ভর করে। থার্ড সিনেমার প্রবক্তা সোলানাস আর গেটিনো তাই সাবধান করেন-

> "আধিপত্যকে পাকাপোক্ত করতে গিয়ে নয়া-উপনিবেশবাদীরা চেষ্টা করে যাতে নির্ভরশীল দেশের জনগণের মধ্যে হীনতা-বোধ সঞ্চারিত হয়। ক্রমেই এই হীনতাবোধসম্পন্ন মানুষ অপরাপর মানুষকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। এটাই তার কাল হয়ে দাঁড়ায়। ভেঙে পড়ে আত্মরক্ষার সমস্ত পাচিল। শোষকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, ''তুমি যদি 'মানুষ' হতে চাও, তাহলে তোমাকে আমার আদলে গড়ে তোল। কথা বলো আমার ভাষায়। অস্বীকার করো নিজের সত্তাকে। তুমি রূপান্তরিত হও আমাতে।'' সেই সপ্তদশ শতকে জেসুইট মিশনারিরা ঘোষণা করেছিলেন, দক্ষিণ আমেরিকাবাসীরা ইউরোপিয় শিল্পকর্ম নকল করতে কতোই না পারদর্শী! নকলনবিশ বা অনুবাদক, দোভাষী, বড়ো জোর একজন দর্শক, এই হচ্ছে নয়া-উপনিবেশকৃত দেশের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা। কোন দিন স্বীয় সৃজন ক্ষমতার প্রতি আসক্ত হবার জন্যে কেউ এদের উৎসাহ দেবে না। সংস্কারবদ্ধতা, শিকড়বিহীন অস্তিত্ব, সংস্কৃতির কসমোপলিটানিজম, শৈল্পিক অনুকরণবাদ, মেটাফিজিকাল অবসন্নতা, স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, এসব কিছু পেয়ে যায় চমৎকার এক চারণভূমি (গেটিনো ও সোলানাস, ১৯৬৯)।"

ফলে, সংগ্রাম ও গণযুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে ঔপনিবেশিক যাবতীয় মূল্যবোধ আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সমূলে উৎপাটন করে, নতুন জনমুখী আবহ তৈরি করা। সোভিয়েত রাশিয়া, গণচীনে এমন কি কিউবা'র মতো ক্ষুদ্র দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূত্রপাত হলে, ভ্লাদিমির লেনিন, মাও সে তুং, ফিদেল ক্যাস্ট্রোর মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদল থেকে বুর্জোয়াবাদ তথা পুঁজিতান্ত্রিক মানসিকতাকে প্রচারযন্ত্র, গণমাধ্যম এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনগণের মানস থেকে বিলুপ্ত করার উদ্যোগ নেন। ফরাসি মনোবিজ্ঞানী ফ্রাঞ্জ ফানো তাঁর '*The Wretched of the Earth*' গ্রন্থে বলেন-

> "To educate the masses politically does not mean, cannot mean, making a political speech. What it means is to try, relentlessly and passionately, to teach the masses that everything depends on them; that if we stagnate it is their responsibility, and that if we go forward it is due to them too, that there is no such thing as a demiurge, that there is no famous man who will take the responsibility for everything, but that the demiurge is the people themselves and the magic hands are finally only the hands of the people (https://www.goodreads.com/quotes/1207436)."

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের দিকে আমরা যদি তাকাই তবে অধ্যাপক ড. নাদির জুনাইদ এর ভাষায় বলতে হয়, ‘‘কেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সমসাময়িক জরুরি ও গুরুতর সমস্যাগুলির মুখোমুখি হওয়ার প্রচেষ্টা খুব কম চোখে পড়ে সেই প্রশ্ন বিশ্লেষণ করা দরকার। স্বাধীন বাংলাদেশেও দ্রুতই পুরনো পাকিস্তানি ব্যবস্থার মতো ফিরে এসেছিল সামরিক শাসন। পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও সমাজে বিভিন্ন পুরনো সমস্যা টিকে থাকা নির্দেশ করে, নতুন সমাজেও মানুষের চিন্তার মুক্তি পরিপূর্ণভাবে ঘটেনি। রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা তাই উপেক্ষা করার সুযোগ নেই (https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/28717)।’’

আজকের একবিংশ শতকে পৃথিবীর ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায়, আগ্রাসি, নয়া-সাম্রাজ্যবাদীদের এবং নয়া কলোনিয়াল ভাবনার প্রলয়ঙ্করী উত্থান। গত শতকের শেষে, সমাজতন্ত্রের ঘাঁটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিলুপ্তির সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য দেশগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তারে আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকার নানা দেশে আবার সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে নয়া ঔপনিবেশিক চিন্তার আগ্রাসন শুরু করে। এক্ষেত্রে ইউরোপের নানা ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সমূহ বাদ যায় না। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ভেঙ্গে গেলে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন বলকান রাষ্ট্র, পূর্ব ইউরোপের দেশ সমূহে নয়া আগ্রাসন নেমে আসে। অনেক দেশ নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইউরোপ জুড়ে সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভানিয়া, বসনিয়া, সারায়েভোর গৃহযুদ্ধে নিহত হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ। বিশ্বজুড়ে একে গৃহযুদ্ধ আখ্যায়িত করলেও, এর পেছনে ছিল সামাজিক আর অর্থনৈতিক আধিপত্যের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ইন্ধন। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে শুরু হয় ইরাক আক্রমণ তথা ‘উপসাগরীয় যুদ্ধ’, যা প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে চলতেই থাকে পুরো দশক জুড়ে। গত শতকের নব্বই দশকের পুরো সময়টা মধ্যপ্রাচ্যের ইরাকসহ, আফ্রিকার নানা দেশে জাতিগত হামলা, পূর্ব ইউরোপের মানুষের উপর গণহত্যা, সীমাহীন দুর্ভোগ, দেশান্তর আর নিপীড়ন দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে বিশ্ববাসী।

পরবর্তীতে এই অবস্থার আপাত উন্নতি হলে, একবিংশ শতকের নতুন যুগের সূচনায়, ২০০১ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরের টুইন টাওয়ার হামলা সারা পৃথিবীর মানুষ বিস্মিত ও হতবাক হয়ে পড়ে। হামলার জন্য অভিযুক্ত আল কায়েদা ও তালেবান সরকারের উৎখাতের নামে মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশে এবার যৌথ আক্রমণ শুরু হয়। ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে’ এই যুদ্ধের নেতৃত্বে থাকলো আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড সহ সেই পুরোনো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরাই। ২০০১ সাল থেকে এখনো পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের বিরাজমান সংকটের কোন সুরাহা হল না। একে একে আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া সহ নানা স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ মিত্রবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারের

কাছে ন্যস্ত হল। নিত্য নতুন সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ আর বিদ্রোহ নির্মূলের প্রচার ঘটিয়ে নানা দেশ আক্রমণ করে চলেছে। সিরিয়া, ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ নানা দেশে চলছে ষড়যন্ত্র। সিরিয়ার মার্কিনবিরোধী সরকারকে উৎখাত করার জন্য গৃহযুদ্ধের সূচনা করে লক্ষ লক্ষ শিশু, নারী ও পুরুষকে হত্যা করা হয়েছে। দেশান্তরী হয়েছে হাজার হাজার পরিবার। নানা ধরণের সংকট, জাতিগত বৈষম্য, অন্যায়ের ফাঁক গলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা যেকোনো অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তারে ছড়িয়ে পড়ছে। এক সময়ের সমাজতান্ত্রিক ও শোষিত রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে রাশিয়া, চীন ও ভারতও এখন নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে নিজেরাও আগ্রাসী ও আধিপত্য বিস্তারে সামিল হচ্ছে।

পশ্চিমা মিডিয়া আর প্রথম বিশ্বের প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার চলচ্চিত্র সেই অনুপাতে এই পরিস্থিতি উপস্থাপনের চেষ্টা করে সফল হতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রে পশ্চিমা গণমাধ্যম আর চলচ্চিত্রগুলো বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদের উপর চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র আর নিউজ কাভার করে সন্ত্রাসবাদের নামে এই আগ্রাসী যুদ্ধকে বিশ্ববাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। ফলে, আক্রান্ত দেশ বা টার্গেট জনগোষ্ঠী সম্পর্কে পশ্চিমা মিডিয়া সৃষ্ট প্রোপাগাণ্ডা বা মিথ্যা তথ্যের কারনে বিরূপ বা ভ্রান্ত ধারনার জন্ম নেয়। এই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সমূহ তাদের কাঙ্ক্ষিত আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো থেকে তাদের নির্বাচিত বা নিজস্ব সরকার ব্যবস্থা থেকে নয়া ঔপনিবেশিক সরকারের হাতে গিয়ে পড়ে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে আক্রান্ত ও নিপীড়িত রাষ্ট্রগুলোর নির্মাতা'রা আবার চলচ্চিত্রকে সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী শক্তির মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে নিবেদিত আছেন। আপাত অর্থে এই চলচ্চিত্রগুলো তৃতীয় চলচ্চিত্র বা রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের সরাসরি মুখপাত্র না হলেও তৃতীয় চলচ্চিত্রের নানা বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান। এমনকি সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবেও এই চলচ্চিত্রসমূহ নিপীড়িত বা শোষিত দেশের জনগণের সার্বিক মানসিকতা ও বাস্তবতা বোঝাতে সক্ষম হয়, যাতে বিশ্ববাসী সত্য উপলব্ধি করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে সামিরা মাখমালবাফ এক আলোচনায় বলেন-

> ''The prevailing cinematic view of the world is that of the First World imposed on the Third World. Africa has been seen from the French point of view and not from the African point of view, nor have the French and Americans been seen from the African point of view. The digital revolution will surpass that imbalance. The First World will thus lose its centrality of vision as the dominant view of the world. The globality of our situation will no longer leave any credibility for the assumptions of a centre and a periphery to the world. We are now beyond the point of thinking that we received the technique from the West and then added to it our own substance. As a filmmaker, I will no longer be just an Iranian attending a film festival. I am a citizen of the world.

> Because from now on the global citizenship is no longer defined by the brick and mortar of houses or the printed words of the press, but by the collective force of an expansive visual vocabulary(https://www.wsws.org/en/articles/2000/06/makh-j28.html)."

পৃথিবীর ইতিহাস এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এখন প্রতিদিন জটিল ও সমস্যা সঙ্কুল হয়ে উঠছে। একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে একে অপরের সাথে সংঘাত আর যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে ঠিক তেমনি অপরাপর শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে আক্রান্ত দেশগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে রক্ষণাত্মক সংগ্রাম করে চলেছে। ফলে, আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে নিঃশেষ হচ্ছে মানুষের জীবন ও মানবিক মূল্যবোধ। জঙ্গিবাদ, মার্কিন আগ্রাসন এবং সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ পন্থীদের সংঘর্ষে প্রতিদিন নিহত হচ্ছে নারী, শিশুসহ অনেকে। এদিকে ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, পাকিস্তান ইত্যাদি রাষ্ট্র ইতিমধ্যে ব্যর্থ রাষ্ট্রের তালিকায় নাম লিখিয়েছে। সৌদি আরবের নেতৃত্বে এবং আমেরিকার সহযোগিতায় ইয়েমেনে চলছে আক্রমণ। ইসরায়েল প্যালেস্টাইন নিত্য ঘনীভূত সংকট, ইরানের পারমানবিক অস্ত্র নির্মাণ, মায়ানমারের রোহিঙ্গা হত্যা ও উচ্ছেদ সহ প্রতিদিন নতুন নতুন সংকট ও সমস্যার সংবাদে বিশ্ববাসী এখন যারপরনাই বিভ্রান্ত। তুরস্ক, বাংলাদেশ, ভারত, আফ্রিকার নানা দেশের মানুষ সদা আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় দিনাতিপাত করছেন। আবার ইউরোপ বা আমেরিকার দেশগুলোও খুব বেশি শান্তিতে আছে তা নয়, তারাও সারাক্ষণ নানা সন্ত্রাসী আক্রমণ, জঙ্গিবাদী বোমা হামলা ইত্যাদি সংকটে বিপর্যস্ত। কিন্তু এর মধ্যেও মানুষ বেঁচে আছে, থাকার চেষ্টা করছে। আর শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের তথা চিন্তাশীল মানুষের কাজ হবে এই মানুষকে তাদের প্রজ্ঞার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে সত্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। আজকের একজন চলচ্চিত্রকার শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট দেশের বা জাতির চলচ্চিত্র নির্মাতা নন, তিনি বৈশ্বিক এবং তাকে তার বিষয়গত সমস্যা বা সত্যকে পৃথিবীর মানুষের কাছে সার্বজনীন ভাবে তুলে ধরতে হবে, যাতে পরিস্থিতি, পরিবেশ এবং সামাজিক-রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিজেকে প্রস্তুত করে রাখতে পারেন।

একটি নিষিদ্ধ সত্যকে মুক্ত করা মানেই ক্রোধ ও পরাভব-আকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনাকে মুক্ত করা। যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি অপসারণের মাধ্যমে এই আমরা, যারা নতুন মানুষে পরিণত হয়েছি, তাদের সত্য হচ্ছে একাধারে একটি অশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা এবং 'জীবনের একমাত্র বাস্তব সম্ভাবনা'। উদ্যোগী বিপ্লবী চলচ্চিত্রকে সহায়তা করে 'তার শত্রু-বিনাশী দৃষ্টিভঙ্গি, তার কল্পনা শক্তি এবং তার উপলব্ধি ক্ষমতা'। দেশে ইতিহাস, লড়াকু কর্মীদের মধ্যে প্রেম-অপ্রেম, জাগ্রত জনতার সংগ্রাম প্রভৃতি মহান বিষয় বস্তুগুলোর পুনরাবির্ভাব ঘটে ঔপনিবেশিক আবহাওয়া মুক্ত ক্যামেরার লেন্সের সামনে।

চলচ্চিত্রকার প্রথম বারের মতো অনুভব করেন যে তিনি মুক্ত। তিনি আবিষ্কার করেন যে সিস্টেমের মধ্যে কোন কিছুই খাপ খায় না, অথচ সিস্টেমের বাইরে বা এর বিরদ্ধে যা কিছুই ঘটুক না কেন সব টেকসই হয়ে যায়। কারণ, তখন 'সবকিছুই করার বাকি থেকে যায়'। আগেই উল্লেখ করেছি, যা গতকাল অযৌক্তিক এ্যাডভেঞ্চার হিসেবে প্রতীয়মান ছিল, তা আজকে 'অপরিহার্য প্রয়োজন ও সম্ভাবনা' হিসেবে দেখা দিয়েছে (গেটিনো ও সোলানাস , ১৯৬৯) ।

গ. তৃতীয় চলচ্চিত্র : প্রেক্ষিত বাংলাদেশঃ

৩.১ বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস, গণআন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রাম :

> "শিল্পকলার যে কোনো শাখায় উপস্থাপিত রাজনৈতিক বক্তব্য দর্শকের চিন্তা প্রখর করে তোলে; আর এই প্রখরতা সৃষ্টি করে আত্মবিশ্লেষণের আগ্রহ। সমস্যাসঙ্কুল সময়ে বিদ্যমান ব্যবস্থা মানুষের যে নির্বিকারত্ব টিকিয়ে রাখতে চায়, রাজনৈতিক উপন্যাস বা কবিতার মতো একটি রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের সমাজ-বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপিত প্রশ্ন মানুষের সেই নির্বিকারত্ব বা স্বস্তিতে আঘাত করে। এমন আঘাতের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় যে অপরাধবোধ বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার প্রবণতা সেই মানসিক অনুভূতি অবশ্যই বৈপ্লবিক" (https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/28717)।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীন হয় এবং ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। প্রধানত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান এবং হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় ভারত। যদিও সংগ্রামী আর বিপ্লবী ভাবনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা ভারতের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কারণ ছিল – উপমহাদেশের চিরস্থায়ী একটি সমস্যা নির্মাণ, দেশীয় বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ আর মুসলিম জাতীয়তাবাদের উগ্রতা, চরমপন্থা আর ঘৃণার রাজনীতির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে লিপ্ত থাকবে বছরের পর বছর। ভারত ও পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল ব্যক্তি আর সাম্যবাদী শিবিরের মানুষ এই স্বাধীনতাকে প্রহসন বলে মনে করলো। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো দেশীয় শোষক আর হিন্দু-মুসলিম বুর্জোয়া আর পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে এই স্বাধীন দেশ হস্তান্তরিত হলো। আপামর সর্বহারা জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ কুক্ষিগত করে জাতীয়তাবাদী হিন্দু ও মুসলমান সরকারদের হাতে ন্যস্ত হলো সদ্য স্বাধীন দুটি রাষ্ট্র - ভারত ও পাকিস্তান।

নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তান দুই হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দুটি প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত হয় – পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তান।

ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে যোজন যোজন ব্যবধানে অবস্থিত এ দুটি অংশের মধ্যে মিল ছিল কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মে। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই এর পূর্ব অংশ, পশ্চিম অংশের তুলনায় নানাভাবে বঞ্চিত হতে থাকে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছর ছিল পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস (https://bn.wikipedia.org/s/93l)।

সেই বঞ্চনা আর শোষণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাংলাদেশের মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে মার্কিন মদদপুষ্ট পাকিস্তানের সামরিক সরকারের সাথে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবী নিয়ে সরকারী বাহিনীর গুলিতে নিহত হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফি সহ অনেক ছাত্র; আহত হলেন আরো অনেকে। সেই ধারাবাহিকতায় গণমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত দল আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে সামরিক বাহিনী আর রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চলতে থাকে সংলাপ, বৈঠক আর আলাপ–আলোচনা। কিন্তু আলোচনার প্রহসনমূলক সময় ক্ষেপনের আড়ালে, পরিকল্পিত ভাবে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়লে একটি জনযুদ্ধের তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা ঘটে। ২৫ মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঢাকায় অজস্র সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ ও ই.পি.আর.কে হত্যা করে এবং বাঙালিদের জনপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেফতারের পূর্বে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

পরিকল্পিত গণহত্যার মুখে সারাদেশে শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধযুদ্ধ। জীবন বাঁচাতে প্রায় ১ কোটি মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সামরিক বাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর), ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ, সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্য এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষ দেশকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কব্জা থেকে মুক্ত করতে কয়েক মাসের মধ্যে গড়ে তোলে মুক্তিবাহিনী। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে মুক্তিবাহিনী সারাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিহত করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে।

পাকিস্তান নামক অগণতান্ত্রিক এবং অবৈজ্ঞানিক রাষ্ট্র গঠনের পর থেকেই পশ্চিম-পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্র বাঙালিদের বা পূর্ব-পাকিস্তানীদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে। তারা বাঙালিদের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে। এরই ফলশ্রুতিতে বাঙালির মনে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে থাকে এবং বাঙালিরা এই অবিচারের

বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করে। এ সকল আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকতেন সমাজের সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীরা। তাঁরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালিদের বাঙালি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফলেই জনগণ ধীরে ধীরে নিজেদের দাবি ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে, যা পরবর্তীতে তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে ধাবিত করে। এজন্য শুরু থেকেই বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। যুদ্ধের শুরু থেকেই পাকিস্তানী বাহিনী বাছাই করে করে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করতে থাকে। যুদ্ধকালীন পুরো সময়টাতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর টার্গেটে থাকে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি কর্মীরা। ২৫ মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনার সাথে একসাথেই বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষককে ২৫শে মার্চের রাতেই হত্যা করা হয়। পাকিস্তানী সেনারা অপারেশন চলাকালীন সময়ে খুঁজে খুঁজে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করতে থাকে। এই অবস্থায় দেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ পালিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কলকাতায় পালিয়ে যান। এদের অনেকেই মনে করেন, শুধুমাত্র অস্ত্র, ট্রেনিং আর গেরিলা পদ্ধতিতে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ মার্তৃকাকে রক্ষা করা যাবে না। দেশে বিদেশে পাকিস্তানী বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার চিত্র তুলে ধরতে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি করতে শিল্পী, সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতারা শিল্পকে হাতিয়ার বানিয়ে নেমে পড়েন সংগ্রামে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এই শিল্পী, নির্মাতাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৩.২ *যুদ্ধকালীন গেরিলা চলচ্চিত্র নির্মাণ:*

আর্জেন্টিনার চলচ্চিত্রকর্মীরা যাঁদের গেরিলা চলচ্চিত্রকার হিসেবে কল্পনা করেছিলেন, যে তৃতীয় চলচ্চিত্রের রুপরেখা তারা হাজির করেছিলেন, বাংলাদেশে জহির রায়হান ছিলেন তারই প্রতিভূ। তৃতীয় চলচ্চিত্র আন্দোলনের কর্মীরা মনে করেন, বিপ্লবী ছবি নির্মাণের জন্য বিপ্লবী সরকার কিংবা অনুকূল পরিবেশের দরকার নাই। শত প্রতিকূলতা আর সীমাবদ্ধতার ভেতরই উজ্জীবিত করার মত ছবি তৈরি সম্ভব। লাতিন আমেরিকায় বিপ্লব এর জোয়ার থেকেই তৃতীয় চলচ্চিত্রের ধারণার উদ্ভব। বাংলাদেশের মানুষের ওপর যে অন্যায় অত্যাচার চলছিল সেটার জবাব দিতে এদেশের বাঙ্গালী ও আদিবাসীরা তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র, জহির রায়হানও সামিল হয়েছিলেন তাদের সঙ্গে, তাঁর অস্ত্র ছিল ক্যামেরা। বন্দুক বা ক্যামেরা হাতে সমাজকে পালটে দেয়ার সংগ্রামে উভয়ই গেরিলা। বাংলাদেশেও গেরিলা জহির রায়হান দেখিয়েছিলেন ক্যামেরা হাতে যুদ্ধ করা সম্ভব (http://www.somewhereinblog.net/blog/julqernine92/29835087)।

বাংলাদেশে মূলধারার চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে জহির রায়হান ও আলমগীর কবীর দুজনই ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। যদিও

তারা দুজন ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে কলকাতা যান। কিন্তু একই উদ্দেশ্য আর প্রত্যয় এর কারণে কলকাতায় তাঁরা একত্রিত হন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরতে সচেষ্ট থাকেন। জহির রায়হান মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকেই দেশের একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নির্মাতা ছিলেন। একটু ভিন্ন আঙ্গিকে বলতে গেলে তৃতীয় সিনেমার চর্চায় জহির রায়হানের একটি উদাহরণই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; যার নাম *'জীবন থেকে নেয়া' (১৯৭০)*।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে বাঙালির স্বাধীনতার যে মূলমন্ত্র তিনি উচ্চারণ করেছেন *'জীবন থেকে নেয়া' (১৯৭০)* চলচ্চিত্রে তা দেশ-কাল ছাপিয়ে তৃতীয় সিনেমার আন্তর্জাতিক মানচিত্রে স্থান করে নেওয়ার কথা ছিল; যদিও বাস্তবে হয়নি। সম্ভবত জহির রায়হান সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতা বা প্রচারবিমুখতাই এর জন্য দায়ী। অথচ সবচেয়ে সফল দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা যে *'ব্যাটল অব আলজিয়ার্স'* (১৯৬৬) চলচ্চিত্রের নাম উচ্চারণ করি তা কিন্তু নির্মিত হয়েছিল সফল বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর, স্বাধীন দেশে, সেইসব বিপ্লবীর পৃষ্ঠপোষকতায়। আর *'জীবন থেকে নেয়া' (১৯৭০)* নির্মিত হয়েছিল সবচাইতে প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থা ও গণ-আন্দোলনের সময়, যে চ্যালেঞ্জ তাকে পেরোতে হয়েছে সাফল্যের সঙ্গে, কৌশলে। আর সেজন্যই তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে রূপকের, যার জাদুকরী ক্ষমতা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত টের পেয়েছিল (https://moniramoni.wordpress.com/)।

১৯৭১ সালে জহির রায়হান ভারতে আশ্রয় নেয়া মুক্তিকামী সব চলচ্চিত্র শিল্পীদের সমন্বয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের সপক্ষে প্রতিষ্ঠা করেন "বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলী সমিতি" যার সভাপতি হলেন জহির রায়হান আর সাধারণ সম্পাদক হলেন সৈয়দ হাসান ইমাম। সংগঠনের উদ্যোগে সীমিত বাজেটে স্বল্প দৈর্ঘ্যের অনেকগুলো প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরবর্তীতে জহির রায়হানের সাথে যোগ দিলেন আলমগীর কবির। তাঁরা পাকিস্তানী বাহিনীর গণহত্যা, নির্যাতন আর ভয়াবহতাকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তুলে আনলেন। একে একে নির্মিত হল, *'স্টপ জেনসাইড'* (১৯৭১: জহির রায়হান), *'আ স্টেট ইজ বর্ণ'* (১৯৭১: জহির রায়হান), *'লিবারেশন ফাইটারস'* (১৯৭১: আলমগীর কবির), *'ইনোসেন্ট মিলিয়নস'* (১৯৭১: বাবুল চৌধুরী), *'লেট দেয়ার বি লাইট'* (১৯৭১: জহির রায়হান) এর মতো উল্লেখযোগ্য সব তথ্যচিত্র।

বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখ্যযোগ্য ছবি হল *'স্টপ জেনোসাইড'* (১৯৭১)। তৃতীয় ধারা চলচ্চিত্রের প্রভাব এই তথ্যচিত্রে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। বলা ভুল হবে না, বিশ্বব্যাপী তৃতীয় ধারায় নির্মিত চলচ্চিত্র সমূহের মধ্যে *'স্টপ জেনোসাইড'* একটি বিশেষ চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য। সাদা কালো আর ইংরেজি ভাষায় করা এই চলচ্চিত্রের ধারা বর্ণনা, রচনা ও পাঠ করেন

খ্যাতনামা চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির। ৩৫ মি.মি. ফরম্যাটে নির্মিত চলচ্চিত্রটির ক্যামেরায় ছিলেন অরুণ রায় এবং সম্পাদনা করেন দেবব্রত সেনগুপ্ত।

দিগন্ত বিস্তৃত আধামরা মানুষের চলমান মিছিল, যারা দেহের শেষ শক্তি নিয়ে চলেছে পার্থিব জীবনের শেষ সম্বলকে মাথায় করে। উদ্ভ্রান্ত এইসব মানুষের চোখে মুখে মানুষ হত্যার বিভৎস অভিজ্ঞতা লেগেছিল। ভাবলেশহীন এইসব মানুষ ক্ষুধার্ত জীর্ণদেহে হেঁটে এসেছে পঁচিশ,পঞ্চাশ কিংবা একশ মাইল। কোথায় গন্তব্য তারা নিজেরাও জানে না। ১৯৭১'র ২০ জুলাই যখন বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকা বনগাঁও-য়ে এই দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী হচ্ছিল তখনই নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে উচ্চারিত হচ্ছিল মানবতার বুলি। অথচ সেদিনই মার্কিন জেট ফাইটার, হেলিকপ্টার আর গানশিপগুলো ভিয়েতনামের গ্রামাঞ্চলে নৃশংস রকেট হামলা চালিয়ে হাজার হাজার নিরীহ সরল মানুষের দেহ ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। বি-ফিফটি টু বোমারু বিমান সাইগনে পনের হাজার পাউন্ড ওজনের ডিউজিক আটার নামের নতুন বোমার পরীক্ষা মূলক ব্যবহারও করেছে। সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোসর পশ্চিম পাকিস্তানের নৃশংস গণহত্যাকে ধমক দিতেই জহির রায়হান তৈরি করেন '*স্টপ জেনোসাইড*'(১৯৭১)। জহির রায়হান ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে শুনেছেন রাজশাহী জেলার একগ্রাম থেকে পালিয়ে আসা আশি বছরের এক বৃদ্ধের করুণ কথা, কিভাবে পাকিস্তানী হানাদাররা বর্বরভাবে শত শত পুরুষকে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে, নারীদের ধর্ষণ করেছে আর যাবার সময় গ্রামের সব বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে ছাই করে দিয়েছে। আশি বছরের বৃদ্ধ জানেন না কেন তাদের উপর এই অত্যাচার করা হলো। পছন্দের ব্যক্তিকে বা দলকে ভোট দেওয়াই কি এত বেশী অপরাধের! জহির রায়হান আর সহ্য করতে পারেন নি, ক্যামেরার ওপার থেকেই চিৎকার করে বলে উঠলেন "স্টপ...স্টপ দিস ব্লাডি জেনোসাইট"। এই বন্ধ করার ধমক তখন বিশ্ব মানবতার আহবানে রূপ নেয়। জাতীয় মুক্তির আন্দোলন মানবতার বৃহত্তর লড়াইয়ে উন্নীত হয় এই চলচ্চিত্রে। বিশ্বের অন্যান্য যেসব দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানুষ লড়াই সংগ্রাম করছে, এই ছবি হয়ে উঠেছে তাদেরও কণ্ঠস্বর। তিনি বিষয়টা এমন ভাবে দেখান যে, চলমান এই বিধ্বস্ত মানুষরাই যেন হাজার বছরের বিধ্বস্ত মানুষের মিছিল। ইয়াহিয়ার বর্বরতা ফুটে উঠেছে হিটলার, মুসোলিনীদের পটভূমিতে (http://www.somewhereinblog.net/blog/julqernine92/29835087)। জহির রায়হান বা বাংলাদেশের নির্মাতাদের বাইরেও তৎকালীন ভারত সরকারের সহযোগিতায় অনেকগুলো ছোটবড় তথ্যচিত্র আর নিউজরীলের মাধ্যমে দেখানো হয় বাঙ্গালীদের স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং পাকিস্তানীদের নির্যাতন নৃশংসতার প্রামাণ্য ইতিহাস। ১৯৭১ সালে নির্মিত '*স্টেট ইজ বর্ণ*' তথ্যচিত্রে ৪৭' থেকে ৭১' পর্যন্ত বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং স্বাধীন বাংলা সরকারের মন্ত্রীসভার সদস্যদের সাক্ষাৎকার সাল অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, জহির রায়হান যুদ্ধকালীন সময়ে প্রতিকূল পরিবেশে বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের যে সংগ্রামী বা বিপ্লবী ধারা নির্মাণ করেছিলেন, তাঁর ধারাবাহিকতা খুব বেশী পরিলক্ষিত হয় না। জহির রায়হানের হাত ধরে বাংলাদেশে তৃতীয় ধারার প্রতিবাদী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম যে গুরুত্বপূর্ণ তিনি তা অনুধাবন করে দেখিয়েছেন। এখনো বাংলাদেশের সংগ্রামী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে তাঁর নিজের ও তত্ত্বাবধায়নে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো মূল্যায়িত হয়ে থাকে। স্বাধীনতা লাভের অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর অন্তর্ধান হলে স্বাধীনতার পরবর্তী অনুকূল পরিবেশে তাঁর সহযোগী বা আর কাউকেই সংগ্রামী চলচ্চিত্র নির্মাণের তথা তৃতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের চেষ্টা উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি।

৩.৩ *যুদ্ধ পরবর্তী চলচ্চিত্র ধারা ও চলচ্চিত্র আন্দোলন :*

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে পাকিস্তানি পাক হানাদার বাহিনীর আত্নসর্মপনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। আমাদের জাতীয় মুক্তির জন্য যেসব চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং শিল্পীরা লড়াই করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে যারা রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন ছিলেন, তাঁরা স্বাধীন দেশের সিনেমাকে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির বাহন হওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন। অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত প্রযোজকদের হাত থেকে সিনেমা শিল্পকে মুক্ত করে তাকে সমাজতান্ত্রিকরণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছিল। ..... (যুদ্ধকালীন সময়ে) মুজিব নগরে তাজউদ্দীন মন্ত্রীসভার কাছে এই পরিকল্পনা পেশ করা হয়। তখন মনে হয়েছিল যে এই মন্ত্রীসভা বুঝি খুব সাড়া দিচ্ছেন। দুমাসের মধ্যেই দেশ স্বাধীন হল। শেখ মুজিবর রহমান স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা করলেন। ইতিমধ্যে উপরোক্ত পরিকল্পনার কথাও হারিয়ে গেল এবং সুন্দরভাবে বিস্মৃত হল (কবীর, ১৯৭৩)।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পূর্ববর্তী বা যুদ্ধকালীন সময়ের সকল আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন পরবর্তী সময়ে একে একে হারিয়ে যেতে থাকলো। বিধ্বস্ত দেশের নড়বড়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে একদল চরম সুবিধাবাদী ও লুটেরা শ্রেণী বিকশিত হতে থাকে। সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা আর স্বাধীনতাকামী মানুষের সামাজিক অবস্থানের চেয়ে শক্তিশালী হতে থাকে সুযোগ সন্ধানী, দুর্নীতিবাজ আর স্বাধীনতা বিরোধী কৌশলী লোকজন। এই প্রভাব থেকে শিল্প, সংস্কৃতি আর চলচ্চিত্রও বাদ গেল না। পাকিস্তান চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে যুক্ত বাণিজ্যমুখী আর সস্তা বিনোদনের অশিক্ষিত আর সুযোগ সন্ধানীরা বঙ্গবন্ধু সরকারের নানা অনুগ্রহ আর সুবিধা নিয়ে নিজেদের বীরত্ব আর মুক্তিযুদ্ধের আবেগকে উপজীব্য করে গড়পড়তা আর নিম্ন মানের চলচ্চিত্র নির্মাণ করে ইন্ডাষ্ট্রিতে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নিতে লাগলো। ফলে, তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো উপনিবেশ, আগ্রাসনের আর সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে স্বাধীন হওয়া দেশগুলোর

মতো কিংবা লাতিন আমেরিকার বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক সরকারের উদ্যোগে কিউবা, চিলি বা আর্জেন্টাইন চলচ্চিত্রের মতো দেশ গড়ার চলচ্চিত্র নির্মাণ বাংলাদেশে আর সম্ভব হল না। এই বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নাদির জুনাইদ আলোকপাত করেন-

> "একটি গণযুদ্ধের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন ছিল পুরনো উপনিবেশী সমাজকাঠামোর চিন্তাসমূহ প্রত্যাখ্যান করা। স্বাধীন সমাজে নতুন চিন্তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিল্পকলার বিভিন্ন শাখা বিশেষ করে চলচ্চিত্রও ভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা জরুরি ছিল। যে অল্পসংখ্যক চলচ্চিত্রে প্রথাবিরোধী চলচ্চিত্র-ভাষা ব্যবহার এবং রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানেও প্রায়ই সমকালীন সময় সরাসরি তুলে ধরা হয়নি (https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/28717)।"

যুদ্ধশেষে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে যে চলচ্চিত্র কর্মীরা মাঠে নেমেছিলেন তার পরিচয় মেলে ঢাকায় নির্মিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা থেকেই। ১৯৬৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ছিল ৩৩টি, ১৯৭০ সালে সেটা বেড়ে হয়েছিল ৪১টি, যুদ্ধের আগে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ছাড়া ১৯৭১- এ আর কোনও ছবি নির্মাণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে যুদ্ধের আগের নির্মীয়মান ছবিসহ ৭২ সালেই ২৯টি ছবির মুক্তি পাওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই উদ্দীপিত চলচ্চিত্র-সমাজেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধশেষের স্বল্প সময় পরিসরে, ১৯৭২ সালের মধ্যেই সম্পন্ন হল চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত '*ওরা এগারো জন*' (১৯৭২), মমতাজ আলী পরিচালিত '*রক্তাক্ত বাংলা*' (১৯৭২), ফখরুল আলম পরিচালিত '*জয়বাংলা*' (১৯৭২), আনন্দ পরিচালিত '*বাঘা বাঙ্গালী*'(১৯৭২), এবং সুভাষ দত্ত পরিচালিত '*অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী*' (১৯৭২)। চাষী নজরুল ইসলামের '*ওরা এগারো জন*' ব্যবসায়ও বিপুল সাফল্য এনে দিয়েছিল। তুলনায় অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী শৈল্পিক আকাঙ্ক্ষায় ছিল অনেক বেশি আন্তরিক। মধ্যবিত্তের উন্মূল মানসিকতা মুক্তিযুদ্ধের রূঢ় বাস্তবতাকে কীভাবে গ্রহণ করেছিল তার পরিচয় এই ছবিটিতে ফুটে উঠেছে। সদ্য বিগত যুদ্ধের আবেগঘন স্মৃতির প্রভাবে প্রায় প্রতিটি ছবিতেই ছিল কাঁচা আবেগের প্রাবল্য। মনে করা হয়েছিল আবেগের প্রবলতা হয়তো বেশি সংখ্যায় দর্শককে সিনেমা হলে টানবে (https://arts.bdnews24.com/?p=2263)। যদিও সকল দালাল আর সুবিধাবাদী শ্রেণীর চলচ্চিত্রকে পাশ কাটিয়ে সমাজ, রাষ্ট্র আর অর্থনৈতিক অবস্থার যথার্থ চিত্রায়ণ উঠে এসেছে কিছু চলচ্চিত্রে। এসব চলচ্চিত্রকে আমরা সরাসরি তৃতীয় ধারার সংজ্ঞায় বিপ্লবী বা প্রতিবাদী চলচ্চিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করতে না পারলেও সামাজিক সমালোচনা আর দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় আমরা রাজনৈতিক বলতে পারি নিঃসন্দেহে। বাংলাদেশের যুদ্ধোত্তর সময়ে একধরণের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা

প্রবাহ, রাজনৈতিক চিন্তা ও সামাজিক অবক্ষয়ের চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি ক্ষীণ হলেও, সৎ প্রচেষ্টার ধারা পরিলক্ষিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে এবং মুক্তিযুদ্ধের পরের দশকেও বাংলাদেশে মূলধারার বিনোদনধর্মী চলচ্চিত্রের বিভিন্ন উপাদান যেমন কাহিনীর গতানুগতিক ও অতি সহজ ধারাবাহিকতা, উদ্ভাবনী ও জটিল চলচ্চিত্র কৌশলের অনুপস্থিতি, অভিনয়ে অতিরিক্ত আবেগের ব্যবহার প্রভৃতি প্রত্যাখ্যান করে বিকল্প ধারার ছবি নির্মিত হয়েছিল কেবল হাতে গোণা কয়েকটি। গতানুগতিক ছবির কাঠামো কিছুটা অনুসরণ করেও রূপকের মাধ্যমে শক্তিশালী রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদানের মধ্য দিয়ে জহির রায়হান যেমন তাঁর ছবি '*জীবন থেকে নেয়া*' (১৯৭০) সম্পূর্ণ ভিন্ন করে তুলেছিলেন সমসাময়িক বাংলা চলচ্চিত্রসমূহ থেকে, তেমন রূপকধর্মী কাহিনীর মধ্য দিয়ে তীব্র রাজনৈতিক সমালোচনা প্রদানের চেষ্টা স্বাধীনতার পরের দশকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে চোখে পড়েনি। প্রাধান্য পায়নি সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার বিভিন্ন জরুরি দিককে সরাসরি মোকাবেলা করার প্রয়াস। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল আলমগীর কবির নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহ। সত্তরের দশকে আলমগীর কবিরের কয়েকটি ছবির (*ধীরে বহে মেঘনা-, সূর্যকন্যা, রূপালী সৈকতে*) মাধ্যমে এদেশের শৈল্পিক এবং প্রথাবিরোধী ছবির অনুরাগী দর্শকরা নিজ দেশে তৈরি নান্দনিকভাবে উদ্ভাবনী এবং বক্তব্যধর্মী চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই ছবিসমূহে কখনো সরাসরি, কখনো অপ্রত্যক্ষভাবে পরিচালক প্রকাশ করেছেন তার রাজনৈতিক বক্তব্যও (জুনাইদ, ২০১৭)।

মুক্তিযুদ্ধের ঠিক দুই বছর পর তৈরি আলমগীর কবিরের '*ধীরে বহে মেঘনা*' (১৯৭৩) ভারত সরকারের সহযোগিতায় নির্মিত হয়। এর বিষয়বস্তুতে যুদ্ধের ঠিক পরই সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তৈরি হওয়া হতাশা যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি মুক্তিযোদ্ধা থেকে হাইজ্যাকারে পরিণত হওয়া তরুণের মনে সৎ ও সঠিক চিন্তা ফিরে আসার মধ্য দিয়ে তিনি দর্শকদের বোধকে নাড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া এই চলচ্চিত্রে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বকীয়তা নির্মাণে কিভাবে এগুতে হবে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্কের ধরণ ইত্যাদি বিষয়ে চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। নিজের ছবিতে সমালোচনামূলক বক্তব্য প্রদানের জন্য আলমগীর কবির প্রায়ই একাজ করে থাকতেন।

একই সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র যা বাংলাদেশের যুদ্ধপরবর্তী সময়কে অনুধাবন করে দর্শকদের মাঝে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয় তার নাম, '*আবার তোরা মানুষ হ*' (১৯৭৩)। অভিনেতা, গায়ক, গীতিকার এবং চলচ্চিত্র পরিচালক খান আতাউর রহমান। এই ছবিতে সাম্প্রতিক বাস্তবতার বিবরণ কতোটা সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা বিশ্লেষণের জন্য মুক্তিযুদ্ধের অল্প সময় পর আমাদের সমাজে দেখতে পাওয়া কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করার পর তাদের প্রতিরোধের জন্য গড়ে উঠেছিলো

বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজ। মুক্তিবাহিনীতে যেমন সামরিক বাহিনী, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এবং পুলিশের বাঙালি সদস্যরা ছিলেন তেমনি ছিলেন সারা দেশের বহু বেসামরিক মানুষ যাদের যুদ্ধ করার কোনো প্রশিক্ষণ ছিলো না। এই মানুষদের মধ্যে একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের ছাত্র-শিক্ষকরা ছিলেন, তেমনি ছিলেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুররাও। মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য এই বেসামরিক মানুষরা কয়েক মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন (জুনাইদ, ২০১৭)।

আলোচ্য চলচ্চিত্রে চিত্রায়িত মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের এই সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী মুক্তিযোদ্ধা শ্রেণীর প্রতি রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের উপেক্ষা, তাদের ক্ষুব্ধতা, সমাজ বিচ্ছিনতা আমাদের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উপর জার্মান সাহিত্যিক এরিক মারিয়া রেমার্ক রচিত বিখ্যাত উপন্যাস *'দ্য রোড ব্যাক'* এর কথা মনে করিয়ে দেয়। কাহিনিতে সাতজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা যারা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় একটি কলেজের ছাত্র। তাদের প্রিয় অধ্যাপকের আহ্বানে তারা দেশ মার্তৃকাকে হানাদার বাহিনী থেকে রক্ষা করা সংকল্পে পড়াশুনা ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের পর স্বাধীন দেশে তাদের পরিবর্তিত জীবনের নানা দিক নিয়ে ছবির কাহিনী। যুদ্ধের পর এই তরুণদের হাতে আছে আধুনিক মারণাস্ত্র। কিন্তু তারা তাদের আদর্শ বিসর্জন দেয়নি। অন্যায়ভাবে অস্ত্র ব্যবহার করে অবৈধ সম্পদ গড়ে তোলার পরিবর্তে তারা যেখানেই অন্যায় আর দুর্নীতি দেখেছে - তা প্রতিরোধের চেষ্টা করে। কিন্তু যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে যেন তাঁদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। প্রতিদিন গড়ে উঠছে নিত্যনতুন সুবিধাবাদী, দালাল, খুনি আর দুর্নীতিবাজ। স্বাধীনদেশে সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে নকল মুক্তিযোদ্ধা আর সন্ত্রাসীদের দাপট বেশি। একে একে সবার জীবনে নেমে আসে নির্মম বাস্তবতা। অধ্যাপকের নির্দেশে পুনরায় পড়াশুনায় ফিরে গেলেও, সেখানে তাঁদের ঠাঁয় হয়না। নাম সর্বস্ব সম্মান আর বাহবা নিয়ে তাঁদের জীবন আর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্তু যুদ্ধের সময় যারা ছিল পাকিস্তানী শাসকদের আজ্ঞাবহ আর দেশের মুক্তির বিপক্ষে, তারাই সমাজে একের পর এক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ছে।

'আবার তোরা মানুষ হ' মূলধারার ছবি হলেও এখানে সাম্প্রতিক সময়ে জরুরি সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে খোলাখুলিভাবে, রূপকের সাহায্য ছাড়াই। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক এমনকি বিকল্প ধারার ছবিতেও বর্তমান সময়ে সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা খুব কমই করা হয়েছে। ফলে 'আবার তোরা মানুষ হ' বাংলাদেশের অন্য অনেক চলচ্চিত্র থেকেই আলাদা। অভিনব এবং নতুন নির্মাণশৈলীর ব্যবহার এই ছবিতে না থাকলেও গতানুগতিক মূলধারার ছবিতে যেভাবে বাণিজ্যিক লাভের জন্য চটক আর চাকচিক্য ব্যবহার করা হয়, তেমন উপাদান এই ছবিতে অনুপস্থিত। দর্শককে বিনোদন প্রদান নয়, বরং সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার সমালোচনা করাই ছবিটির মূল উদ্দেশ্য তা বোঝা যায়। মুক্তিযুদ্ধের মাত্র দুই বছর পরই সমাজে

কিভাবে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে, কিছু মানুষ যারা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ কোনোভাবেই ধারণ করে না তারা কিভাবে বিত্তশালী হয়ে উঠছে আর দেশপ্রেমিক, সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন সমাজে কতোটা হতাশাগ্রস্ত এবং টাকার জোরে ক্ষমতাবান হওয়া মানুষদের দ্বারা নিগৃহীত এবং অবহেলিত সেই অশুভ দিকগুলোই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে। ... ... ছবিটির নামের মধ্য দিয়ে হয়তো দেশে তৈরি হওয়া নতুন সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে তরুণদের তথা বহু মানুষের আবারো সচেতন আর প্রতিবাদী অবস্থান গ্রহণের মানসিকতা অর্জনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। প্রচলিত কাঠামোর মাধ্যমে কাহিনী এগিয়ে নেয়া হলেও সাম্প্রতিক বাস্তবতার বিভিন্ন সমস্যা সরাসরি তুলে ধরা এবং কঠোর সামাজিক সমালোচনা প্রদানের কারণে ছবিটিকে অগতানুগতিক, সাহসী এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি চলচ্চিত্র হিসেবেই বিবেচনা করা যায় (http://www.sachalazatan.com/naadir_junaid/56801)।

কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে মারাত্মকভাবে। এর আগে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রতিকূলতা নিয়ে নির্মাতাদের জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়নি। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর রাষ্ট্রীয় ভাবে মুক্তিযুদ্ধের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছিল স্পর্শকাতর। এ বিষয়ে উল্লেখ্য–"মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে ছবি নির্মাণ করতে হলে ইতিহাসের কিছু কিছু উপাদান যেমন শেখ মুজিব, পাকিস্তানি হানাদার ইত্যাদি প্রসঙ্গ প্রায়শই ব্যবহার করতে হয়। বিভিন্ন সময়ের সরকারগুলোর কাছে এ-সব ছিল খুবই অপছন্দের। ফলে সেন্সরের নানা বাধার আশঙ্কায় মুক্তিযুদ্ধের ছবি নির্মাণের প্রেরণাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবে তারপরও মূলধারায় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে দু-একটা ছবি হয়েছে শৈল্পিক মানের দিক তা থেকে খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। হারুনুর রশিদের '*মেঘের অনেক রং*' (১৯৭৬) পঁচাত্তর-উত্তর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি ভালো ছবি বলা যায়। এই সময়ে এ জে মিন্টুর '*বাঁধন হারা*' (১৯৮১), শহীদুল হক খানের '*কলমীলতা*' (১৯৮১), মতিন রহমানের '*চিৎকার*' (১৯৮১) শৈল্পিক বা বাণিজ্যিক কোনও দিক থেকেই খুব একটা উল্লেখযেগ্য কাজ বলা যায় না (https://arts.bdnews24.com/?p=2263)।

পরবর্তীতে সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমানের ক্ষমতাসীন সামরিক শাসনের সময়ে সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিসমূহের উত্থান পরিলক্ষিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রণোদনা দেয়া হয় জাতীয়তাবাদী চেতনাকে, যার ভিতর দিয়ে দুর্নীতিবাজ, দালাল, ধর্মীয় উগ্রতাবাদ, সাম্প্রদায়িক শক্তির জোয়ার বইতে থাকে বাংলাদেশের মানচিত্র জুড়ে। হত্যা, গুম, গ্রেফতার, জেল, রাজনৈতিক নির্বাসন এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শিবির গুলোতে অত্যাচার আর নিপীড়ন নেমে আসে। এই সামরিক শাসনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি তথা চলচ্চিত্র শিল্প। এই সময়ে থেকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের

মান, মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় শুরু হয়। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করলে বাংলাদেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য সামরিক সরকারের অধীনে শাসিত হতে থাকে। মূলত এই এরশাদ সরকারের স্বৈরাচারী সময়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পের সামাজিক এবং কাঠামোগত ধ্বংস নিশ্চিত হয়। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন এর নিয়ন্ত্রণ চলে যায় আমলা আর সামরিক বাহিনীর দালালদের হাতে। ফিল্ম সেন্সর বোর্ড থেকে শুরু করে নানা নিয়ন্ত্রণ, চাপ আর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে স্বাধীন শিল্প সম্মত চলচ্চিত্র নির্মাণের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। কেবল বাণিজ্যমুখী সস্তা বিনোদনমূলক চলচ্চিত্র আর এর বাইরে শিল্পসম্মত দু-একটি ব্যতিক্রম চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়াস ছাড়া, বাংলাদেশে ধারাবাহিক কোন আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মিত হয় নাই।

ঘ. সম্বনিত ফলাফল: তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রঃ সংকট ও সম্ভাবনা:

> "আমাদের মত আধা-সামন্ততান্ত্রিক আর আধা-উপনিবেশিক দেশে একজন সৎ চলচ্চিত্র নির্মাতার দূর্গতির সীমা থাকে না। অনেকগুলো বাধার দেয়ালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করতে হয় তাকে। অর্থ। সমাজ। ধর্মান্ধতা। রাজনৈতিক সংকীর্ণতা। শিক্ষাগত অনগ্রসরতা। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনার অভাব। জীবনবোধের অভাব। উঠতি ধনিক শ্রেণীর অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে রাতারাতি কোটিপতি হবার চিন্তা। কাঁচামালের অভাব ও চড়া দর। নতুন লেখাপড়া শেখা বা হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠা উন্নাসিকের দল (রায়হান, ১৯৮০)।"

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্র নির্মাণের আপাদমস্তক সমস্যা গুলো জহির রায়হান যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময় থেকে বের করার চেষ্টা করেছে। তিনি জানতেন, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিতর চলচ্চিত্র নির্মাণের চেষ্টা একটি যুদ্ধ যজ্ঞের মতোই। চলচ্চিত্র নির্মাণে অর্থ লগ্নি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি বলেন-

> ''চলচ্চিত্র বানাতে প্রথম যে জিনিসটার দরকার সে হচ্ছে টাকা। যাদের আছে তারা হচ্ছেন প্রধানত অসৎ ব্যক্তি (কারণ সৎপথে কোনোদিনও ধনবান হওয়া যায়না)। এই সব অসৎ ব্যক্তিরা সৎ চলচ্চিত্র তৈরি করতে টাকা খাটাতে চাইবেন না এটা সহজ কথা। তারা সেখানেই চাইবেন যেখানে দর্শকদের অসৎ বাসনাগুলোকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে তুলে তার তাৎক্ষণিক তৃপ্তি সাধনের মাধ্যমে মুনাফা লোটা যায়। তাই একজন সৎ চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রথম যে দেয়ালটির সামনে এসে হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়ান সেটা হচ্ছে অর্থের দেয়াল (রায়হান, ১৯৮০)।''

সৎ চলচ্চিত্রের প্রাথমিক যে শর্ত সেটা হচ্ছে চলচ্চিত্রটিকে সবরকমের সংকীর্ণতা এবং গোঁড়ামি মুক্ত হতে হবে, বিষয়বস্তু এবং তার ক্রমঅভিব্যক্তি এবং তার ব্যঞ্জনায়। আবেগ ও তার স্বতস্ফূর্ততায়। বক্তব্য এবং তার নির্ভীকতায়। কোনোরকমের বিরোধ থাকলে চলবে না। কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধ সমাজে মুক্তবুদ্ধির চাষ করতে গেলেই বিরোধ বাধা স্বাভাবিক। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসক ও শোষক শ্রেণি সবসময় মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ঘৃণার ও সন্দেহের চোখে দেখে। তারা চায় সবরকমের সংস্কারগুলো সমাজের সকল স্তরে নিষ্ঠার সঙ্গে লালিত-পালিত ও রক্ষিত হোক। তাহলে তাদের খুব সুবিধে হয়। শাসক শ্রেণি তাই এই সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক রীতিনীতি এবং সংস্কারগুলোকে রক্ষা করার জন্য কতগুলো আইনের পরিখা খনন করে রাখেন (যেমন সেন্সর বোর্ড)। সৎ চলচ্চিত্র নির্মাতা তাই তার বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে যে বাধা ও বিরোধের মুখোমুখি হন সেগুলো হচ্ছে-

সমাজের সঙ্গে বিরোধ।
শাসক শ্রেণীর সঙ্গে বিরোধ।
আইনের পরিখাগুলোর সঙ্গে বিরোধ।
....

তাই বলছিলাম। আমাদের মত আধা-সামন্ততান্ত্রিক আর আধা-উপনিবেশিক দেশে একজন সৎ চলচ্চিত্র নির্মাতার দুর্গতির সীমা থাকে না (রায়হান, ১৯৮০) ।

৪.১ প্রতিবাদী চলচ্চিত্রের নির্মাণ প্রচেষ্টা ও সংকট:

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রাণপুরুষ জহির রায়হানের উপরোক্ত বক্তব্যের চেয়ে শক্তিশালী অনুধাবন এদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ে আর কেউ আলোকপাত করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। এই বক্তব্য বর্তমান সময় পর্যন্ত কি পরিমান প্রাসঙ্গিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকের বাংলাদেশে স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর পরে এমনকি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি ক্ষমতাসীন থাকার পরেও বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের শৈল্পিক, নান্দনিক বা সামাজিক চিত্রায়ণের বলিষ্ঠ ভূমিকার কোন উদ্যোগ চোখে পড়ে না। এখনো চলচ্চিত্র সরকার ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমূহে অবহেলিত এবং সুচতুরভাবে উপেক্ষিত। আর প্রতিবাদী চলচ্চিত্রের কথা বলতে গেলে, সেটি একেবারে অসম্ভব পর্যায়ে আছে বলা যেতে পারে।

"ষাটের দশকে বৈষম্য আর শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিবাদের ফলে যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল সেটি তুলে ধরার চেষ্টা তৎকালীন বাংলা চলচ্চিত্রে দেখা যায়নি। হয়তো স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের নিয়ন্ত্রণের কথা চিন্তা করেই চলচ্চিত্রকাররা এতে অনাগ্রহী ছিলেন। তখন সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের সাহসী সমালোচনা তুলে ধরা হয়েছিল একমাত্র '*জীবন থেকে নেয়া*' ছবিতেই

(https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/28717)।" কিন্তু সেই '*জীবন থেকে নেয়া*' কিংবা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের কয়েকটি ভিন্ন মাত্রা আর স্বাদের প্রকাশ ব্যতিত খুব একটা কাজ দেখা যায় না। আশির দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগত ক্রমশ অধোঃগতির দিকে যেতে থাকে। অসৎ, দুর্নীতিবাজ আর সুবিধাবাদী লোকজনের হাতে দিন দিন চলচ্চিত্র ইন্ডাষ্ট্রি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির লেখেন-

> "পঞ্চাশের [দশকে] চলচ্চিত্র দর্শকের একটি বিরাট অংশ ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। ষাটের দশকে অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত দর্শককে মেসমেরাইজ করে তাড়াতাড়ি লগ্নি টাকার পাঁচ-সাত গুণ মুনাফার লোভে স্থানীয় চিত্রশিল্পে আমদানি করা হল এমনই সস্তা মালের (এছাড়া সঠিক পরিভাষা এই মুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছি না), যা মধ্যবিত্ত দর্শককে সিনেমা হল থেকে তাড়িয়ে টেলিভিশনের কাছে পাঠিয়ে দিল। এই শ্রেণীর দর্শক যাতে ভুলেও না আসে, সেজন্য প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশও করা হল দুর্বিষহ। টিকেটের কালোবাজারি, নোংরা পরিবেশ, ছেঁড়া কাপেট, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলে টিকেটে অতিরিক্ত মাশুল নিয়েও শো চলাকালে এয়ারকন্ডিশন প্ল্যানটির সুইচ অফ করে দেয়া, দুর্গন্ধময় টয়লেট ইত্যাদি ইত্যাদি মারফত এই এক কালের নিয়মিত দর্শকশ্রেণীকে নিশ্চিতভাবে তাড়িয়ে দেয়া হল (কবির, ২০১৮)।"

এরই ফলশ্রুতিতে, আলমগীর কবিরের নেতৃত্বে একদল তরুণ শিক্ষিত নির্মাতার আবির্ভাব ঘটে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রাঙ্গণে। চলচ্চিত্রের উপর নানা কোর্স, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ডিসকোর্স ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে নতুন চলচ্চিত্র নির্মাতা সৃষ্টির কার্যক্রম চলতে থাকে। রাজধানী ও রাজধানীর বাইরে বিভিন্ন চলচ্চিত্র সংসদ গুলো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আলমগীর কবির তাঁর সতীর্থদের বুঝাতে সক্ষম হোন, মানের দিক থেকে চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন করতে হলে, প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে চলচ্চিত্র দীক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

সিনেমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় আলমগীর কবিরের এই ভাবনা পরবর্তীতে স্বাধীনদেশে আরো গতি পায়। বলা চলে, হয়তো তার পথ অনুসরণ করেই ১৯৭৫ সনে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ পুনে ফিল্ম ইন্সটিটিউট-এর শিক্ষক সতীশ বাহাদুরকে নিয়ে প্রথমবারের মতো ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন কোর্স আয়োজন করে। এই সতীশ বাহাদুরই পরবর্তীতে ১৯৭৭ সনে তার দ্বিতীয়বারের সফরে এলে বাংলাদেশে ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মূল রূপরেখা দিয়ে যান। পরের বছর আর্কাইভের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলেও মূলত দেশের চলচ্চিত্রমনস্ক তরুণদের সাথে আর্কাইভের কর্মকান্ডের সংযোগ ঘটে যখন পুনরায় আলমগীর কবিরই সেখানে চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করলেন। বাংলাদেশে এখন স্বাধীন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে সুপরিচিত

কয়েকজনেরই যাত্রা শুরু আলমগীর কবিরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ফিল্ম আর্কাইভের এই কোর্সগুলো থেকে (https://arts.bdnews24.com/?p=7311)। এর মধ্যে আরেকটি প্রজন্ম ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে নিয়োজিত হলেন। সালাউদ্দিন জাকী, বাদল রহমান, শেখ নিয়ামত আলী, মাসিহ উদ্দিন শাকের সহ তরুণ নির্মাতাদের একটি স্কোয়াড তৈরি হয়ে যায়, যারা সরাসরি তৃতীয় চলচ্চিত্রের যোদ্ধা না হলেও সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক যথার্থ বাস্তব পরিস্থিতি উপস্থাপনে সাহসী ভূমিকা রাখেন। আশির দশকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ভূমিতে বাণিজ্যিক ধারার বাইরে নতুন একগুচ্ছ পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের সমাবেশ ঘটে। এদের মধ্যে আলমগীর কবীরের '*রুপালী সৈকতে*' (১৯৭৯), মসিহ্উদ্দিন শাকের আর শেখ নিয়ামত আলী নির্মিত '*সূর্যদীঘল বাড়ি*' (১৯৮০), সালাউদ্দিন জাকী নির্মিত '*ঘুড্ডি*' (১৯৮০), বাদল রহমানের '*এমিলের গোয়েন্দাবাহিনী*' (১৯৮০), শেখ নিয়ামত আলীর '*দহন*' (১৯৮৫) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই চলচ্চিত্রগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতসহ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র অঙ্গণে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সমাদৃত হয়।

কিন্তু বাংলাদেশে গত চার দশকে যে চলচ্চিত্রসমূহ মূলধারার বাণিজ্যিক ছবির পদ্ধতি পরিহার করে তৈরি হয়েছে, সেই চলচ্চিত্রসমূহ সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন জরুরি এবং জটিল রাজনৈতিক সমস্যা সরাসরি তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফল এমন দাবি করা যায় না। খুব অল্পসংখ্যক বাংলাদেশি চলচ্চিত্রই তৈরি হয়েছে যেখানে বর্তমান সময়ের সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর জন্য যারা দায়ী তাদের প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করা এবং তাদের কঠোর সমালোচনা তুলে ধরা ছিল চলচ্চিত্রকারদের মূল উদ্দেশ্য। যে অল্পসংখ্যক চলচ্চিত্রে গতানুগতিকভাবে বিনোদনমূলক উপাদান গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে প্রথাবিরোধী চলচ্চিত্র ভাষা ব্যবহারের এবং রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানেও প্রায়ই সমকালীন সময় সরাসরি তুলে ধরা হয়নি। সেখানে রাজনৈতিক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে পরোক্ষভাবে, অতীতের কোনো সময় তুলে ধরার মধ্য দিয়ে। যেমন, স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের সমালোচনা করলেও আলমগীর কবিরের '*রূপালী সৈকতে*' (১৯৭৯) ছবিটিতে কাহিনীর সময়কাল ষাটের দশকের পূর্ব পাকিস্তান, ১৯৭০-এর বাংলাদেশ নয়। মসিহ্উদ্দিন শাকের আর শেখ নিয়ামত আলী নির্মিত '*সূর্যদীঘল বাড়ি*' (১৯৮০) সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র মানুষের দুর্দশার বিবরণ আর তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সমালোচনা তুলে ধরলেও কাহিনীর পটভূমি ভারতভাগের ঠিক আগে পূর্ব বাংলার এক গ্রামের জীবনযাত্রা......ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার প্রবণতাটির স্পষ্ট সমালোচনা উঠে এসেছে তারেক মাসুদের '*মাটির ময়নায়*' (২০০২)। ছবিটি যখন নির্মিত হয় তখন এই সমালোচনা প্রাসঙ্গিক হলেও ছবির কাহিনীতে দেখানো হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগে পূর্ব

পাকিস্তানের গ্রাম এবং মফস্বল শহরের পরিবেশ (https://www.ntvbd.com/arts-and-literature/24083/)।

৪.২ চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলন:

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে চলচ্চিত্রের আবিষ্কার, পাশ্চাত্য তথা সারা বিশ্বে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। চলমান চিত্রের মাধ্যমে বাস্তবতার বিনির্মাণ অল্প সময়ের মধ্যে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের যেকোনো শাখার মধ্যে চলচ্চিত্রকে শ্রেষ্ঠতর স্থানে অধিষ্ঠিত করে। কিন্তু ভাষা, আঙ্গিক ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য,আর্থিক লাভ বা প্রদর্শণের সুবিধা ও সংকট নিরীখে এক দেশের চলচ্চিত্র অন্যদেশে প্রদর্শিত হওয়া দুরূহ ছিল। ফলে, প্রদর্শক ও পরিবেশকদের রাজনীতি, রুচি ও ব্যবসার আঙ্কিক হিসেবের কারণে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র উপভোগ করার সুযোগ থাকতো না। এরই ফলশ্রুতিতে, দেশে দেশে চলচ্চিত্র সংসদ বা সিনে ক্লাব গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

সাধারণ দর্শকরা চলচ্চিত্র দেখে বিনোদিত হয় আর প্রযোজক ও নির্মাতারা ব্যবসায়িক স্বার্থে বিনোদনের নানা উপাদান দিয়ে তৈরী করে চলচ্চিত্র নামক পণ্যটি.....অন্যদিকে শিক্ষিত ও সচেতন দর্শকরা চলচ্চিত্রের মাঝে খোঁজে শিল্পরূপ। তারা জানতে চায় এর ইতিহাস, নির্মাণ কৌশল ও অন্যান্য অবদান। ফলে অনিবার্যভাবেই চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক এবং নান্দনিক রূপ নিয়ে একটি বিরোধের সৃষ্টি হয়। আর এ প্রেক্ষাপটেই শিল্প মন্ডিত চলচ্চিত্রের পক্ষে সচেতন দর্শক সৃষ্টির লক্ষ্যে গড়ে উঠে চলচ্চিত্র সংসদ (http://vorerbd24.com/ 8937)। চলচ্চিত্র সংসদের ধারণাটি উন্নত রুচি, শিল্পবোধ, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং প্রগতিশীল মানসিকতার সাথে সম্পৃক্ত। জন্মলগ্ন থেকেই চলচ্চিত্র বিবেচিত হয়েছে সাধারণ জনরুচির আকর্ষণ হিসেবে। তখনো পর্যন্ত থিয়েটার চর্চা ছিল অভিজাত শিল্প চর্চার প্রতীক। আর চলচ্চিত্রের আবেদন ছিল শুধুমাত্র প্রমোদ উপকরণ হিসেবে অনেকটা সার্কাস, ম্যাজিক, ক্রীড়া, কৌতুক, নাচ-গানের মতোই। বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরীতে এর জন্ম হলেও এর বিস্তার ঘটেছে পণ্য হিসেবে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। কিন্তু চলচ্চিত্র ইতিহাসের খুব অল্প সময়ের মধ্যে নানা দেশের রুচিশীল নির্মাতা, শিল্পী, আর সংস্কৃতি ব্যক্তিত্বের হাত ধরে চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

আমাদের এই ভূখন্ডে গত শতকের ছয়ের দশকের শুরুতে চলচ্চিত্রকে একটি শিল্পমাধ্যম হিসেবে মান্য করে একে সম্যকভাবে বোঝার ও বোঝানোর তাগিদ থেকেই চলচ্চিত্র-সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়। পৃথিবীর সব জায়গাতেই ফিল্ম সোসাইটি তৈরির মুখ্য উদ্দেশ্য একটাই। সেটা হচ্ছে, ভালো ছবি দেখার চাহিদাকে জাগানো এবং ভালো ছবির সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করা। ১৯৬৩ সালে 'পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদ' প্রতিষ্ঠা করে উদ্যোক্তারা সৎ, শুদ্ধ ও নির্মল চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও সেসব চলচ্চিত্র আস্বাদন-অনুধাবন-

অধ্যয়ন-উপলব্ধি, সেগুলো নিয়ে আলোচনা, চলচ্চিত্র-বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ, সর্বোপরি রুচিবান দর্শক তৈরি করার সেই চেষ্টারই সূত্রপাত করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, 'পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদ' স্থাপনের উদ্যোগ নেন আনোয়ারুল হক খান, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, ওয়াহিদুল হক, মুহম্মদ খসরু, মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, আবদুস সবুর, সালাহ্উদ্দিন, মনিরুল আলম প্রমুখ। আনন্দের কথা, উদ্যোক্তাদের মধ্যে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তি, মুহম্মদ খসরু এখনো সর্বতোভাবে সক্রিয় (http://www.kaliokalam.com/চলচ্চিত্র-সংসদ-আন্দোলনের/)। বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরু থেকেই চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বলা যায়, আজকের বাংলাদেশের সৃষ্টিশীল, শিল্প ও নান্দনিক চলচ্চিত্র বিকাশে সরকার, চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বা অন্যকোন সরকারী উদ্যোগের চেয়ে চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীদের নিরলস পরিশ্রম, আত্মত্যাগ, পরিকল্পনা, উদ্যোগ এবং কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে অনেক ক্ষেত্রে সরকারগুলো বাধ্য হয়ে উপেক্ষিত এবং ক্ষয়ে পড়া চলচ্চিত্র শিল্পকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছে এবং এখনো কাজ করে চলেছে। চলচ্চিত্রের প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে নানাবিধ অর্জন ঘটেছে। ১৯৮০-৮১ সাল থেকে চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীদের আন্দোলন, বিভিন্ন দাবী-দাওয়া, পরামর্শ এবং প্রস্তাবনার ফলে জাতীয় ফিল্ম আর্কাইভ, ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট নির্মিত হয়েছে। গত বেশ কিছু বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতীয় মূল্যবোধ, স্বাধীনতার ইতিহাস ও আদর্শ এবং বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে স্বল্পদৈর্ঘ্য, পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং তথ্যচিত্র নির্মাণে সরকারী অনুদান প্রথা চালু করা হয়েছে। এছাড়া চলচ্চিত্র বিষয়ক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, বিভিন্ন চলচ্চিত্রকারের রেট্রোস্পেকটিভ, ফিল্ম-ফেস্টিভাল, অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স ইত্যাদি কর্মকান্ড সংসদগুলোর বিকাশ ও চলচ্চিত্র সংস্কৃতির বিস্তৃতিকে সম্ভব করে তুলেছে।

৮০'র দশকের শুরুতে, চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের চর্চার একটি বড় অর্জন ছিল, সংসদ গুলোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা এবং অনুপ্রেরণায় চলচ্চিত্র নির্মাণের আন্দোলন। আলমগীর কবিরের নেতৃত্বে তরুণ নির্মাতাদের নিয়ে গঠন করা হল দেশের বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সংগঠন 'বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরাম'। ১৯৮৮ সনে এই সংগঠনের উদ্যোগে দেশে প্রথমবারের মতো বেসরকারিভাবে আয়োজিত আর্ন্তজাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই সংগঠনের নের্তৃত্বে থাকা নতুন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাতারা প্রায় সকলেই ছিলেন আলমগীর কবিরের ভাবশিষ্য ও শিক্ষার্থী। তাঁরা হলেন, তানভীর মোকাম্মেল, মোরশেদুল ইসলাম, তারেক মাসুদ সহ অনেকে। পরবর্তীতে মানজারে হাসিন মুরাদ, তারেক শাহরিয়ার, আমিনুল ইসলাম খোকন, জাহিদুর রহিম অঞ্জনসহ অনেকেই চলচ্চিত্র সংসদ এবং চলচ্চিত্র আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

এই স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলনের ফলে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের বাইরে একের পর এক মুক্তি পেতে থাকে চিন্তাশীল সব নান্দনিক ছবি। ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, বাণিজ্যিক ছবির অশ্লীলতা, সিনেমা হলের দম বন্ধ করা নোংরা পরিবেশের কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সিনেমা হল এবং মূলধারার চলচ্চিত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। চলচ্চিত্র সংস্কৃতি থেকে বিতাড়িত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবার এই বিকল্প ধারাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালো। মূলধারার বাইরে ১৬ মিমি ক্যামেরা দিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ ছিল মূলত লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার তৃতীয় চলচ্চিত্র আন্দোলনের আদলে একটি মুক্ত আন্দোলন। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, দেশে তখন সামরিক সরকার। লেঃ জেনারেল এরশাদের স্বৈরাচারী একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার আর সংগ্রামে লিপ্ত প্রগতিশীল ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সমাজ। ফলে, একটি রাজনৈতিক সচেতনার তাগিদ অনুভব করছিল এই স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাতারা। এরমধ্যে নিজস্ব অর্থায়নে বা সংসদগুলোর সহযোগিতায় বিভিন্ন দূতাবাসের সহায়তা, এনজিওদের প্রযোজনা ইত্যাদি মিলে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলন এগিয়ে গেল। যেহেতু মূলধারার বাণিজ্যমুখী চলচ্চিত্রগুলোর বিশাল পরিবেশনা ও প্রদর্শনের সাথে প্রতিযোগিতা করে পারা যাবে না, স্বল্পদৈর্ঘ্যে চলচ্চিত্র নির্মাতারা বিকল্প চলচ্চিত্র প্রদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে চলচ্চিত্রগুলো দেশের নানা প্রান্তের দর্শকের কাছে নিয়ে গেলো। এক্ষেত্রে তাঁদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করলো দেশের নানা প্রান্তে থাকা প্রগতিশীল চলচ্চিত্র সংসদ, সিনে ক্লাব বা ফিল্ম সেন্টারগুলো। এমনকি নানা দূতাবাসের আয়োজনে এই চলচ্চিত্রসমূহ রুচিশীল মধ্যবিত্ত দর্শকের কাছে সাদরে গৃহীত হল।

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলন তরুণদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ এবং বহুমাত্রিক উদ্দীপনার কাজ করে। ১৯৮২ সালে তানভীর মোকাম্মেল শুরু করেন '*হুলিয়া*' চলচ্চিত্র নির্মাণ কাজ, তারেক মাসুদ শুরু করেন '*আদম সুরত*' এবং মোরশেদুল ইসলাম '*আগামী*'। এই আন্দোলনের প্রথম ফসল ১৯৮৪ সালে, যখন মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত '*আগামী*' মুক্তি পায়। এর পরের বছর '*হুলিয়া*' (১৯৮৫) মুক্তি পায় এবং '*আদম সুরত*' মুক্তি পায় ১৯৮৯ সালে। কিন্তু স্বল্পদৈর্ঘ্য আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য আবির্ভাব ছিল, তারেক ও ক্যাথরিন মাসুদ নির্মিত '*মুক্তির গান*' (১৯৯৫) চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী। প্রতিকূল সরকার এবং একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্রকে পেশাদার প্রদর্শনের নিমিত্তে একযোগে দেশের বিভিন্ন সিনেমা হলে মুক্তি দেয়া ছিল স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলনের কর্মীদের জন্য একটি বিরাট মাইলস্টোন। বার বার সেন্সরবোর্ডের কাঁচির পরেও শ্রেণী, জাত, ধর্ম, দল, মত নির্বিশেষে সারা দেশের মানুষ ১৯৭৫ সালের হত্যাকাণ্ডের পর প্রথম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের চিত্ররূপ দেখতে পেলেন চলচ্চিত্রের বিশাল রুপালী পর্দায়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এ এক নতুন মাত্রা আনল। সারা দেশের চিন্তাশীল, মননশীল, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, লেখক, ব্যবসায়ী, কৃষক, শ্রমিক সিনেমা হলে ঝাঁপিয়ে

পড়লো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র '*মুক্তির গান*' দেখার জন্য। তৎকালীন সময়ে যেকোনো বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের চেয়ে জনপ্রিয়তা বেশি ছিল '*মুক্তির গান*' নামে এই তথ্যচিত্রের। কিন্তু সরকারের চাপে, বেশিদিন হলে থাকতে না পারলেও, তারেক মাসুদ দেশের নানা অঞ্চলের চলচ্চিত্র সংসদ ও ক্ষুদ্র সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় ব্যক্তিগত ভিডিও প্রদর্শন ব্যবস্থায় দেশের নানা প্রান্তে '*মুক্তির গান*' এর প্রদর্শন করতে লাগলেন।

তারেক মাসুদের স্মৃতিচারণে চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিক্ষক রফিকুল আনোয়ার রাসেল বলেন-

> "প্রথম যখন চট্টগ্রামের জলসা সিনেমায় এই দৃশ্য পর্দায় উঠে আসলো, শত দর্শক আবেগে চিৎকার করে উঠেছিল। আমরা যেন চোখের সামনে মহান নেতার বজ্র কণ্ঠে সেই ঘোষণা শুনে শিহরিত – এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত প্রদর্শনীতে বিশাল আধুনিক সাউন্ড সিস্টেমে আবারো উচ্চারিত হলো সেই ভাষণ। ... ... এ প্রসঙ্গে বলি, তারেক ভাই কেবল একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা ছিলেন না, ছিলেন চলচ্চিত্রকর্মীও। ফলে প্রদর্শনী শেষে তিনি মাইকে আহ্বান জানালেন, দর্শকদের মধ্যে যদি কোন মুক্তিযোদ্ধা থাকেন, তাঁকে সামনে আসতে। একজন মুক্তিযোদ্ধা এগিয়ে এলেন। ছবি সম্পর্কে, যুদ্ধকালীন সময় সম্পর্কে তার বক্তব্য জানালেন। 'মুক্তির গান' শেষ হয় কিছু প্রশ্ন রেখে– যা আমাদের ভাবিত করে বাংলাদেশের এই বীর যোদ্ধাদের আমরা কি সঠিক সম্মান ও স্মরণ রাখতে পারবো কিনা? আমরা সেই উত্তর সময়ের কাছে রেখে ফিরে গেছি বার বার। প্রদর্শনী ও দর্শকের মতামতের সম্পৃক্ততা বিষয়টি ল্যাটিন আমেরিকার তৃতীয় চলচ্চিত্র আন্দোলনের ইতিহাস পড়ে জেনে ছিলাম। কিন্তু নিজ দেশের কোন চলচ্চিত্র নিয়ে এই আয়োজন ছিল আমাদের প্রথম চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা। ছবি শেষে মিউজিক বেজেই চলে, জনতার সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই ... ... (রাসেল, ২০১৭)।"

আমাদের চলচ্চিত্র ইতিহাসের ঝুড়িতে তানভীর মোকাম্মেলের '*চিত্রা নদীর পারে*', '*লালন*', মোরশেদুল ইসলামের '*খেলাঘর*', নাসিরউদ্দীন ইউসুফের '*একাত্তরের যীশু*', গোলাম রাব্বানী বিপ্লবের '*স্বপ্নডানায়*', '*বৃত্তের বাইরে*' এবং অভিনেতা তৌকির আহমেদের '*জয়যাত্রা*'-র মতো চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও এক্ষেত্রে বিতর্কের অবকাশকে বাইরে রেখে বলা যায়, আমাদের স্বল্পদৈর্ঘ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক বা প্রতিবাদী চলচ্চিত্রের ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রয়াস খুব বেশি দেখা যায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের নির্মাতাদের মনন ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দ্বিতীয় চলচ্চিত্রের বা

আন্তর্জাতিক উৎসবের জন্য শিল্প ও নন্দন নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণ ধারা বৃদ্ধি পায়। তবে বাংলাদেশে মুক্তভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণের আবহ এবং চলচ্চিত্র নির্মাণে স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই।

৪.৩ মুক্ত চলচ্চিত্রে তৃতীয় চলচ্চিত্রের প্রভাব :

বাংলাদেশের ইতিহাস সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। একশত নব্বই বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন; এরপরের তেইশ বছর দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে বাঙ্গালীদের উপর ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণ, দমন আর নির্যাতন এবং স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ধরে সামরিক স্বৈরাচারী শাসনের মধ্যে অতিবাহিত সময়কে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার মতো একই ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্তে সামরিক বাহিনীর ক্যু'র দ্বারা ১৯৭৩ সালে যেমন চিলির প্রেসিডেন্ট সালভাদোর আলেন্দে নিহত হন, তেমনি ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর লোকেরা নৃশংসভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পুরো পরিবারকে হত্যা করে। তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশই তখন দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রে সামরিক বা পুতুল সরকার কর্তৃক শোষণ, অত্যাচার, হত্যা, নিপীড়নের বাইরে ছিল না। বাংলাদেশের তখন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মাত্রা লাতিন আমেরিকা বা আফ্রিকার অত্যাচারী সামরিক সরকার গুলোর নিপীড়নের সমকক্ষীয় ছিল। দেশের ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী তথা প্রগতিশীল মানুষের উপর সামরিক বাহিনীর কঠোর অনুশাসন নেমে আসে। কিন্তু সেই অনুপাতে আমাদের দেশে তৎকালীন শিল্পী, লেখক, সংস্কৃতিবান বা চলচ্চিত্রকারদের রাজনৈতিকভাবে সোচ্চার হবার প্রবণতা কি খুব দেখা গেছে? কিছু ক্ষেত্রে নাটক বা থিয়েটার চর্চায় গণমানুষের মুক্তির বক্তব্য উচ্চারণে কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ দেখা যায়। কিন্তু চিন্তাশীল চলচ্চিত্র প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে এই ধরনের ছবির প্রসারের জন্য চলচ্চিত্রকাররা মতাদর্শিকভাবে কতটুকু উৎসাহিত হয়েছে?

চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবিরের কথা যদি ধরি, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে গেরিলা বা বিপ্লবী চলচ্চিত্র নির্মাণের যে রূপরেখা শ্রদ্ধেয় জহির রায়হানের উদ্যোগে মুজিব নগর সরকারকে দেয়া হয়েছে, তা পরবর্তীতে হারিয়ে ফেলা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে, তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে বিপ্লবী ও রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাণের চেয়ে বাণিজ্যিক এবং বিনোদনমুখী চলচ্চিত্র নির্মাণকে স্বাগত জানাতেন। আর পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, গণতন্ত্র, বিপ্লব বা রাজনীতি নামক শব্দগুলো সাংস্কৃতিক আবহ থেকে একেবারেই উঠে গেলো। যদিও এর চেয়ে প্রতিকূল পরিবেশে পাকিস্তান সামরিক জান্তার কঠোর শাসনের মধ্যে থেকেও রূপকধর্মী *'জীবন থেকে নেয়া'* (১৯৭০)

নির্মাণের মধ্য দিয়ে কীভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য চলচ্চিত্রে উপস্থাপন করা যায়, জহির রায়হান বহু বছর আগেই তা স্পষ্ট করেছেন।

কিন্তু পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক হতাশা, অগণতান্ত্রিক পরিবেশ, সামরিক বাহিনীর নিপীড়ন, হত্যাকাণ্ড, ছাত্র আন্দোলনের উপর দমন, নিপীড়ন চলচ্চিত্রে তেমন স্পষ্টভাবে তুলে আনতে কেউ সফল হননি। ফলে, মুক্ত বা মূলধারার চলচ্চিত্রে বিচ্ছিন্ন ভাবে সামাজিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, অন্যায় অবিচারের চিত্র উঠে আসলেও, তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারা বা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়ে উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র তেমন লক্ষ্য করা যায় না। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রতিবাদী সম্ভাবনার বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রবীণ চলচ্চিত্রকর্মী মাহবুব আলম বলেন-

> "বাংলা ছবি, বাংলাদেশের ছবি, 'চলচ্চিত্র' হয়ে উঠল না সম্পূর্ণ অর্থে, তার আবার প্রতিবাদী বিশেষণ।......সৌখিন প্রতিবাদ এবং রাজনৈতিক ভাষ্যের সহাবস্থানে কিছু আবেগশালী চলচ্চিত্রকার সৎভাবেই দু'একটা প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যহীনতার কারণে, অক্ষমতার কারণে। এই ব্যর্থতার মূলে ছিল তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তার অস্বচ্ছতা এবং চলচ্চিত্রের ভাষার প্রতি অক্ষমনীয় অজ্ঞতা। যে কারণে কবীর আনোয়ারের 'সুপ্রভাত' (১৯৮০) এবং আমজাদ হোসেনের 'গোলাপী এখন ট্রেনে' (১৯৮০) আমাদের যথেষ্ট আশার একটি শীর্ষ বিন্দুতে তুলে মুহূর্তেই সেখান থেকে বিচ্যুত করে (আলম, ১৯৮০)।"

ধারাবাহিক ভাবে নব্বই দশক এবং একবিংশ শতকের প্রথম দিকে বিচ্ছিন্ন কিছু চলচ্চিত্র বাদ দিয়ে রাজনৈতিক ভাবে উজ্জীবিত করে এমন চলচ্চিত্র মূলধারা বা মুক্ত চলচ্চিত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যা তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারায় সংজ্ঞায়িত করা যায়। তবে ২০১০ সালে প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ *'রানওয়ে'* চলচ্চিত্রে বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় রাজনীতি ও জঙ্গিবাদ উত্থানের একটি সামাজিক চিত্র বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

এছাড়া বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে ইতিহাসভিত্তিক ছবি, কিন্তু এই ছবিগুলো সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়নি এবং এমন অনেক ছবির নির্মাণশৈলীও নান্দনিকভাবে উদ্ভাবনী করে তোলা হয়নি। ফলে কার্যকর রাজনৈতিক ছবি হিসেবে এই ছবিগুলোকে বর্ণনা করা যায় না। কখনো বিভিন্ন চলচ্চিত্রে সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার কাহিনী কিছুটা অগতানুগতিক চলচ্চিত্র ভাষা ব্যবহার করে তুলে ধরার মাধ্যমে পরিচালকরা তাদের কাজ বিনোদনধর্মী ছবি থেকে পৃথক করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এমন অনেক ছবিতেই বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশের সাথে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের সম্পর্ক যথেষ্ট গভীরতার সাথে বিশ্লেষণ করা হয়নি। ফলে ছবিতে উপস্থাপিত ভাগ্যহীন অসহায় মানুষরা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছেন। এই ধরনের

ছবিতে কখনো সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে গ্রামের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি, কখনো কোনো গ্রাম্য ওঝা বা কোনো মাস্তান। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা টিকে থাকার জন্য সত্যিকার অর্থে ক্ষমতাশালী যে মানুষরা দায়ী তাদের দিকে পরিচালকরা অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারেননি। যে ধরনের রাজনৈতিক কারসাজির কারণে দারিদ্র্য, শোষণ, অন্ধ বিশ্বাস, দুর্বলের ওপর অত্যাচার সমাজে টিকে থাকছে তা উন্মোচন করার কোনো চেষ্টাও এই ধরণের ছবিতে দেখা যায়নি। রাজনৈতিক চলচ্চিত্রে কেবল কোনো সমস্যা উপস্থাপন করাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সমস্যার আসল কারণগুলোর গভীর বিশ্লেষণ যা দর্শকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং টিকে থাকা অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদী ও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় করে তুলবে (https://www.ntvbd.com/arts-and-literature/24083/)। লাতিন আমেরিকা তথা তৃতীয় বিশ্বের প্রতিবাদী চলচ্চিত্রকারদের মত আমাদের দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা খুব বেশি প্রতিবাদী ভূমিকায় ছিলেন, একথা বলা যাবে না। পাকিস্তান পর্বে জহির রায়হানের নেতৃত্বে সেই গেরিলা চলচ্চিত্র নির্মাণ চেষ্টায় যে তথ্যচিত্রসমূহ নির্মিত হয়েছে, তাই-ই কেবল উদাহরণ হিসেবে বারবার আসবে। জহির রায়হান সহ বাকিরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে অবস্থানের কারণে, পাকিস্তান সামরিক সরকার হয়তো তাঁদের গ্রেফতার বা হত্যা করতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশ পর্বে আমরা তেমন কোন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বের কারাবরণ কিংবা গ্রেফতার, হয়রানীর ঘটনা শুনতে পাইনি। অথচ অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যহত ছিল এই দেশে বছরের পর বছর। ১৯৭৫ সালের পর বিভিন্ন দফায় সামরিক স্বৈরাচারী সরকারের আমলে রাজনৈতিক চরম অবস্থা পরিলক্ষিত হলেও শিল্প, সংস্কৃতি তথা চলচ্চিত্রে এর প্রভাব খুবই ক্ষীণ।

৪.৪ সেন্সরশিপঃ চলচ্চিত্র বিকাশের অন্তরায় :

> "'সেন্সর' শব্দটির আগমন প্রাচীন গ্রিস থেকে। তৎকালীন সময়ে যারা ম্যাজিস্ট্রেসি করতেন তাদের বলা হতো 'সেন্সর'। এক সময় ব্রিটিশরা মিডিয়াকে শাসন করার জন্য সেন্সর শব্দটি এ উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত করে। গৌরবের সঙ্গে শব্দটিকে বগলদাবা করে আমাদের দেশেও 'সেন্সর বোর্ড' প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য অন্তরায়। এমন অভিযোগ দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা, বিনোদন সাংবাদিক ও বোদ্ধাদের (http://old.dhakatimes24.com/2013/12/09/7639/print)।"

রাষ্ট্র মাত্রই একটি বিদ্যমান ব্যবস্থাকে (তা পুঁজিবাদী হোক, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বা ধর্মতান্ত্রিক) টিকিয়ে রাখার নিমিত্তে, সমাজসচেতন চলচ্চিত্রকাররা যাতে প্রতিবাদী চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে কোন ব্যাঘাত বা অস্থিরতা তৈরি করতে না পারে, তার জন্য

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখবেই। চলচ্চিত্র একটি জটিল শিল্প মাধ্যম। পর্যাপ্ত অর্থায়ন একটি সাবলীল চলচ্চিত্রের প্রধান উপাদান। এছাড়া আছে বিপণন, পরিবেশন এবং প্রদর্শন চলচ্চিত্রকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার নানাবিধ পর্যায়। এর কোন পর্যায়ে ব্যত্যয় হলে, দর্শক একটি চলচ্চিত্র সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে আর জানতে পারে না। কিন্তু চলচ্চিত্রকে একেবারে আঁতুড়ঘরে মেরে ফেলার সবচেয়ে সফল উপায়, সেন্সরশিপ প্রথা। রাষ্ট্রের সেন্সর বোর্ডের অনুমতি ছাড়া কোন চলচ্চিত্রের সাবলীল প্রদর্শন সম্ভব নয়। আমাদের দেশে বর্তমানেও নির্মিত চলচ্চিত্রের অর্ধেকের বেশি চলচ্চিত্র সেন্সরশিপের ছাড়পত্র না পাওয়ার কারণে মুক্তি লাভ করে না। এমন কি শুধুমাত্র রাজনীতি, বিপ্লবী আদর্শ, সমাজ চেতনা বা মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে বক্তব্য সম্বলিত চলচ্চিত্র সেন্সরের খড়গ থেকে মুক্তি পায় না, তা নয়। অনেক সময় উদ্ভট বা সরকারের খেয়ালী কারনেও দর্শককূল একটি প্রয়োজনীয় চলচ্চিত্রের আস্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

সমকালীন পরিস্থিতির বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা এবং মানুষকে পীড়িত করছে এমন সমস্যার যৌক্তিক সমালোচনা চলচ্চিত্রে প্রকাশের চেষ্টায় সমর্থন দেবার পরিবেশ তৈরি না হলে সমাজ-সচেতন, বক্তব্যধর্মী চলচ্চিত্র তৈরি হবে না। সেন্সরের কারণে রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া এবং সমকালীন সমস্যার সমালোচনা সম্ভব নয় এমন আশঙ্কা চিন্তাশীল ছবি নির্মাণে আগ্রহী চলচ্চিত্রকারদের কাজ বাধাগ্রস্ত করবে (https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/28717)। জানা যায়, *'জীবন থেকে নেয়া'* (১৯৭০) নির্মাণের সময় জহির রায়হানকে বার বার পাকিস্তানি সামরিক প্রশাসনের অসন্তোষ আর ক্রোধ মোকাবেলা করতে হয়েছিল। যদিও তিনি একজন স্বৈরাচারী পরিবার প্রধানের দ্বারা অন্যান্য সদস্যদের উপর কঠিন নিয়ম ও অনুশাসনের রূপকধর্মী কাহিনীর মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের সমালোচনা তুলে ধরেন। এ কারণে সরকারি নির্দেশে ছবি থেকে বিভিন্ন দৃশ্য তাঁকে বাদ দিতে হয়, তবুও তিনি সেখানে বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারীসহ বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রামের বহুল দৃশ্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হন।

ভারতের সত্যজিৎ রায়ের বহুল আলোচিত *'হীরক রাজার দেশে'* (১৯৮০) ছবিতে স্যাটায়ারের মাধ্যমে দেশের শাসকদের আচরণের অসঙ্গতি আর সমাজে টিকে থাকা অন্যায়ের প্রতি তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়। এছাড়া, সেনেগালের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ওসমান সেমবেনের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ছবি *'হাল্লা'* (১৯৭৪) সেনেগালের স্বাধীনতা-পরবর্তী শাসকদের শঠতাপূর্ণ আচরণের নির্দয় সমালোচনা তুলে ধরে। তাই অনেক দৃশ্য বাদ দেওয়ার পরই কেবল *'হাল্লা'* চলচ্চিত্রটি মুক্তি দিতে দেওয়া হয় সেমবেনকে। ... তারেক মাসুদ যখন ধর্মীয় গোঁড়ামি, মৌলবাদ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহারের সমালোচনা করে *'মাটির ময়না'* (২০০২) চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন, তখন এমন বিষয়বস্তু স্পর্শকাতর আখ্যা দিয়ে ছবিটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ছবিতে

পরিবর্তন আনতেও বলা হয় চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেককে। এরপর ছবিটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলেও সিনেমা হলগুলোতে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই ঘটনাসমূহ নির্দেশ করে, সমাজের নেতিবাচক দিকের সমালোচনা চলচ্চিত্রে প্রকাশের কাজটি ঝুঁকিপূর্ণ ও কঠিন। তবে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, ওসমান সেমবেন, জহির রায়হান, তারেক মাসুদ এবং বিভিন্ন দেশে আরও অনেক চলচ্চিত্রকার এমন ঝুঁকির মধ্যেই কাজ করেছেন।

লাতিন আমেরিকার চলচ্চিত্র আন্দোলন আর তৃতীয় চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে সামরিক সরকার ছিল আরও ভয়ংকর। প্রদর্শনীতে সামরিক বাহিনীর লোকজন আক্রমণ চালাতো এবং শিল্পী কলা কুশলীদের আটক করে জেলে পুরে অমানুষিক নির্যাতন করা হতো। আন্দোলনের পুরো সময় জুড়ে হাজার হাজার চলচ্চিত্রকর্মী নির্যাতন, দেশত্যাগ আর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য।

লাতিন আমেরিকায় গেরিলা চলচ্চিত্রের বিতরণ ব্যবস্থা দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত। অপরদিকে, হিংসাত্মক আচরণে রয়েছে সিস্টেমের আইনগত অধিকার। আর্জেন্টিনায় বেশ কিছু চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে হামলা এবং ফ্যাসিবাদী নীতি অনুযায়ী চলচ্চিত্রের জন্যে কিছু দমনমূলক আইন প্রণয়ন, ব্রাজিলের 'সিনেমা নোভো'র জঙ্গিবন্ধুদের জন্যে বর্ধিত হারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, ভেনেজুয়েলায় 'লা হোরা দে লস হর্নোস' এর প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা এবং লাইসেন্স বাতিল করা, এসবই নমুনা মাত্র। এছাড়া, মহাদেশব্যাপী কড়া সেন্সর আইনের জন্যে গেরিলা চলচ্চিত্রের অবাধ বিতরণ ও প্রদর্শনের সম্ভাবনা নেই বললেও চলে (গেটিনো ও সোলানাস, ১৯৬৯)।

তবে, বর্তমানে সারা বিশ্বে চলচ্চিত্রশিল্প উন্নয়নে সেন্সর প্রথার বিরুদ্ধে চলচ্চিত্র নির্মাতা, কর্মীরা, অভিনয় শিল্পীরা সোচ্চার অবস্থানে আছেন। এমনকি বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের স্বর্গ হিসেবে পরিচিত হলিউডও প্রোডাকশন কোড সিস্টেম থেকে বেরিয়ে গ্রেডিং বা রেটিং পদ্ধতি ব্যবস্থা করে নিয়েছে অনেক আগে থেকে। এই পদ্ধতিতে চলচ্চিত্রকে নানা ভাগে ভাগ করে একটি মাত্রা দেয়া হবে যা অনুসরণ করবে হল মালিক ও পরিবেশকরা, এমনকি পরিবারের সদস্যরা বুঝতে পারবে কোন বয়সী দর্শকের কি চলচ্চিত্র দেখা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা থাকলে একজন প্রাপ্তবয়স্ক দর্শক যেকোনো চলচ্চিত্রের উপভোগের জন্য নিজেকে উপযুক্ত মনে করবেন। ফলে সামাজিক বা পারিবারিকভাবে তাঁকে বিব্রতকর পরিবেশে পড়তে হবে না। এখানে উল্লেখ্য, শুধুমাত্র রাজনৈতিক বক্তব্য বা শাসককুলের সমালোচনার কারণে সেন্সরে চলচ্চিত্র আটকে দেয়া হয়, তা নয়। অনেকক্ষেত্রে মানবতা পরিপন্থী, ধর্মীয় অনুভূতি, সামাজিকভাবে বিপথগামী, নৈতিকতা বিরোধী বা সাম্প্রদায়িক উসকানি বা নৈরাজ্যমূলক বক্তব্য বা কাহিনীর কারণেও চলচ্চিত্র সেন্সর হতে বাধ্য। তবে সাদামাটা চোখে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সেন্সরবোর্ডের প্রধান বিবেচ্য থাকে সিনেমার রাজনৈতিক ও সংগ্রামী চলচ্চিত্রায়ণ।

এ ব্যাপারে এফডিসির (চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা) মহাপরিচালক পীযুষ বন্দোপাধ্যায় ও চাষী নজরুল ইসলাম কৌশলী অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, 'কোনো গণতান্ত্রিক চর্চায় সেন্সর প্রথা থাকা উচিত না। সেন্সর বোর্ড বাতিল করে সার্টিফিকেশন বোর্ড চালু করে গ্রেডিং পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সম্ভবত সরকার জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালাসহ বিষয়টি বাস্তবায়ন করবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি সেন্সরপ্রথা সমর্থন করি না। তবে এটাও ঠিক, উন্নয়নশীল দেশে সরকারের কাছে একটি নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে (http://old.dhakatimes24.com/2013/12/09/7639/print)।' এটা ঠিক, কোন সরকার বা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সেন্সর বোর্ডকে বিলুপ্ত করে চলচ্চিত্রের স্বাধীন পরিবেশ সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হবেন না। এমন ভাবা ভুল হবে, রেটিং বা গ্রেড সিস্টেমের মধ্য দিয়েও চলচ্চিত্র তার কাঙ্ক্ষিত মুক্তি লাভ করবে, যার কারণে সংগ্রামী, বিপ্লবী বা রাজনৈতিকভাবে সাহসী চলচ্চিত্র নির্মাণের পথ সুগম হবে। চলচ্চিত্রকে স্বাধীন ও মুক্ত করার সংগ্রামী চেষ্টা চলচ্চিত্রকারের, যা তার সামাজিক, দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং এজন্য ব্যক্তির একক সংগ্রাম নয়, চাই মুষ্টিমেয় চলচ্চিত্রকারের সমাজ বদল ও গণ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে নিজেদের আত্মত্যাগ। যেমন, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার তরুণ নির্মাতা, লেখক, শিল্পী, কলা–কুশলীরা লাতিন আমেরিকার সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য শিল্প ও চলচ্চিত্রকে হাতিয়ার করে সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

৪.৫ সম্ভাবনার সুযোগ ও আশার আলো:

> The most terrifying fact about the universe is not that it is hostile but that it is indifferent, but if we can come to terms with this indifference, then our existence as a species can have genuine meaning. However vast the darkness, we must supply our own light (https://www.goodreads.com/quotes/26464).

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বা আন্দোলনের পরিক্রমায় কোন সফলতাই নানাবিধ বাধা প্রতিবন্ধকতা ছাড়া উঠে আসেনি। একটা সময়ে কাগজে কবিতা লেখা বা নিজের ঘরে বসে উপন্যাস বা সঙ্গীত চর্চার মতো চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যেতো না। এখনো যে খুব বেশি পারা যায়, তা নয়। চলচ্চিত্র একটি ব্যয়বহুল এবং সামর্থ্যবান শিল্প মাধ্যম। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় এর গ্রহণযোগ্যতা যেমন অধিক, তেমনি এর আয়োজনের প্রতিকূলতাও বেশি। রাষ্ট্র, প্রশাসন, চিন্তা, দর্শন, আঙ্গিক, শিল্পী, কারিগরি সুবিধা, টেকনোলোজি ইত্যাদি সমস্যার চেয়েও একটি পেশাদার চলচ্চিত্র নির্মাণে সবার উপরে প্রথম এবং প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত তা হল – অর্থ। আজ থেকে শত বছর আগেও এই সমস্যা যেমন ছিল, এখনো সেই সমস্যা থেকে চলচ্চিত্র বের হয়ে আসতে

পারেনি। এই গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখিত জহির রায়হানের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের আমলেও তাঁরা অর্থ সংক্রান্ত জটিলতার মুখোমুখি হয়েছেন সবচেয়ে বেশী। চলচ্চিত্রের এই নানাবিধ সমস্যার কারণে, একটি চলচ্চিত্রকে তার নির্মাতা চক্রের বাইরে স্বাধীন হওয়া, রাজনৈতিক কিংবা প্রতিবাদী হওয়া দুরূহ ব্যাপার। সমাজ সচেতন, গণমুখী শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্র উপস্থাপন হবার আগে বিবেচ্য হয় – আর্থিকভাবে চলচ্চিত্রের সফলতা কতটুকু ? আর প্রতিবাদী বা সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা কি তা ইতিহাসের আলোকে ইতিমধ্যে পর্যবেক্ষিত। ফরাসি পরিচালক জঁ ককতো পঞ্চাশের দশকে তাই বলেছিলেন-

> "চলচ্চিত্র সেদিনই পূর্ণাঙ্গ শিল্পে উপনীত হবে যেদিন তার উপকরণসমূহ পেন্সিল ও কাগজের সমমূল্যের হয়ে উঠবে (https://www.brainzquote.com/quotes/jean_cocteau_385705)।"

একবিংশ শতাব্দীতে দৃশ্য সংস্কৃতির এবং গণমাধ্যমের জগতে একটি যুগান্তকারী আবির্ভাব মোবাইল টেকনোলোজি, ইন্টারনেট, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং সোশ্যাল মিডিয়া তথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা। চলচ্চিত্রে ডিজিটাল বিপ্লবকে আমি কারিগরি জ্ঞানের সর্বশেষ অর্জন হিসেবে দেখি। তবে এই বিপ্লব সিনেমার বিরুদ্ধে নয়। বরং সিনেমা-ইন্ডাষ্ট্রির কিছু পেশাদারী কাঠামো ও চরিত্রের বিরুদ্ধে। ডিজিটাল সিনেমার কারণে আমরা চলচ্চিত্রের কেন্দ্রবিন্দু – চিত্রনাট্য, দৃশ্যায়ন, সৃজনশীল সম্পাদনা, অভিনয়সহ কোনো কিছুই হারাবো না। ডিজিটাল ছবি যা বদলে দেবে, তা হলো চিত্রগ্রহণের ধরণ, আলোর আয়োজন, পোস্ট-প্রোডাকশন ল্যাবের কাজ ইত্যাদি। চলচ্চিত্র উৎপাদন যন্ত্রের এই কারিগরি বিপ্লরের ফলে ইন্ডাষ্ট্রি হিসেবে হয়তো চলচ্চিত্রের মৃত্যু হবে, তবে এই বিপ্লবই চলচ্চিত্রকে সৃজনশীল শিল্প হিসেবে বাঁচিয়ে রাখবে (http://www.somewhereinblog.net/blog/fahmidulhaqblog/28779161)।"

চলচ্চিত্র যেহেতু একটি দৃশ্যগত মাধ্যম অর্থাৎ ক্যামেরা, সম্পাদনা, দৃশ্যায়ন, প্রদর্শন এবং প্রচার টুলস গুলো বর্তমানে মূলত ডিজিটাল প্রযুক্তির উপর প্রধানত নির্ভরশীল। একজন ব্যক্তি এখন নিজের বেডরুম থেকে সরাসরি উন্মুক্ত পৃথিবীর কাছে তার চিন্তা, সংগ্রাম, বক্তব্য, মতামত এমনকি ভিডিও বা ছবির মাধ্যমে প্রমাণ সহ হাজির করতে পারছে। আজকের দিনে চলচ্চিত্র বা ভিডিও নির্মাণ সেই পেন্সিল আর কাগজের পর্যায়ে চলে এসেছে বলে মনে করা যেতে পারে। আজকের পৃথিবীতে শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত মোবাইল ফোন ছাড়া যোগাযোগের বাইরে থাকেন না। প্রান্তিক অঞ্চলের লোকজন এখন বিশেষায়িত এই মোবাইল বা ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের আওতাধীন। স্মার্ট টেকনোলোজির কারণে ক্যামেরা, অডিও গ্রহণ, ডাটা ট্রান্সফার সুবিধা ছাড়া মোবাইল ফোন কল্পনা করা যায় না। ফলে, চিত্রগ্রহণ বা প্রদর্শন বা প্রচার মাধ্যম এখন খুব বেশী আর নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় নেই। ইউটিউব, ভিমেও, ব্লগ, ফেসবুক, সাউন্ড ক্লাউড ইত্যাদি ইন্টারনেট ভিত্তিক মাধ্যমগুলোর ব্যবহারে আমরা যেকোনো ছবি,

শব্দ, চলমান চিত্র পৃথিবীব্যাপী প্রচার করতে পারি, তা সে রাজনৈতিক হোক, সামাজিক হোক কিংবা সাংস্কৃতিক।

গত দশ বছরে মধ্যপ্রাচ্যের আরব বসন্ত নামক জাগরণ, ওয়াল স্ট্রীট আন্দোলন, ভারতের ধর্ষণ বিরোধী, এমন কি আমাদের দেশের ২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধ বিরোধী গণজাগরণসহ পৃথিবীব্যাপী সামাজিক-রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সব আন্দোলনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট-মোবাইলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ফলে, এই মাধ্যম চলচ্চিত্রের রাজনৈতিক সচেতনতা বা প্রতিবাদী দিক প্রসারের প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

হাই-টেক ডিজিটাল টেকনোলজি সারা বিশ্বের স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাণের এক অপার সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। নিজেদের যেকোনো চলচ্চিত্রের জন্য একটি *Canon 5D Mark II* ক্যামেরার সাহায্যে উন্নত মানের ভিজ্যুয়াল ইমেজ অর্জন করা সম্ভব। এর বাইরেও নানা মডেলের, নানা ব্র্যান্ডের ক্যামেরা রয়েছে যা চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেইসাথে আছে কম্পিউটারে উচ্চতর সম্পাদনা বা এডিটিং সুবিধা। ফলে এক হাতে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তা সম্পাদনা করে বাজারজাত করা প্রায় সম্ভব (আনোয়ার, ২০১৪)।

চলচ্চিত্রের ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন ইরানের চলচ্চিত্রকাররা। ফিল্ম বা সেলুলয়েড টেকনোলোজির অহংকার থেকে শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র নির্মাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয় ইরানের সমসাময়িক চলচ্চিত্র। ২০০০ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবের *"The Digital Revolution and the Future of Cinema"* ফোরামে ইরানের নারী চলচ্চিত্র নির্মাতা সামিরা মাকমালবাফ বলেন-

> Cinema has always been at the mercy of political power, particularly in the East, financial capital, particularly in the West, and the concentration of means of production, anywhere in the world. The individual creativity of artists throughout the twentieth century has much suffered from the whimsical practices of this odd combination of forces. The situation at the threshold of the twenty-first century seems to have altered radically. With astonishing technological innovations now coming to fruition, artists no longer seem to be totally vulnerable to these impediments (https://www.wsws.org/en/articles/2000/06/makh-j28.html)

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনে ডিজিটাল প্রযুক্তি এখন শীর্ষে। ৩৫ মিলিমিটার ফরম্যাটে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন ব্যবস্থাপনা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে। সরকারী-বেসরকারি উদ্যোগে সিনেমা হল, প্রযোজনা কিংবা পরিবেশনে এখন ডিজিটাল প্রযুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। মূলধারা বা মুক্ত চলচ্চিত্র নির্মাণে এখন আপামর

চলচ্চিত্রকারদের ডিজিটাল প্রযুক্তিই একমাত্র ভরসা। ইতিমধ্যে বিগত এক দশকের বেশী সময় ধরে, বাণিজ্যিক বা নান্দনিক মানের চলচ্চিত্র নির্মাণে নির্মাতা'রা ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারকে প্রধান্য দিয়েছেন। কিন্তু সেই অনুপাতে রাজনৈতিক বা প্রতিবাদী চলচ্চিত্র নির্মাণের কোন চেষ্টা এখনো পরিলক্ষিত হয়নি। নানা সিনেমায় বিচ্ছিন্ন ভাবে সামাজিক অসঙ্গতি, অসহায়ত্ব কিংবা সামাজিক টানাপোড়েন উঠে এলেও রাজনৈতিক বা প্রতিবাদী বৈশিষ্ট্যের চলচ্চিত্রায়ণের অনুপস্থিতি এখনো বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের দুর্বলতা।

নির্দ্বিধায় বলা যায়, সাম্প্রতিক কালের ডিজিটাল প্রযুক্তি ও তার সার্বিক ব্যবহার এই মুহূর্তে চলচ্চিত্র নির্মাণের যে ক্ষেত্র উন্মোচন করেছে, তার সার্থক ব্যবহারের মধ্যে আমরা তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারার প্রতিবাদী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজ নিগৃহীত, বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদের নিষ্পেষিত শোষিত মানুষের কথা তুলে ধরি।

উপসংহারঃ

তৃতীয় সিনেমা বা থার্ড সিনেমার কথা বলতে গেলে প্রসঙ্গক্রমেই তৃতীয় বিশ্ব শব্দটি চলে আসে। পুঁজিবাদী প্রথম বিশ্ব এবং সমাজতান্ত্রিক দ্বিতীয় বিশ্বের সঙ্গে জোটনিরপেক্ষ তৃতীয় বিশ্বের রয়েছে আর্থ-সামাজিক ফারাক। এই ব্যবধানে চলচ্চিত্রও তার জায়গা করে নেয়। হলিউডি ধামাকা বাণিজ্যিক সিনেমা, যা কি না আর্থিক সাফল্যের মানদন্ডে বিবেচিত হয়, তা প্রথম সিনেমায় সদা বিরাজমান। এর বিপরীতে রয়েছে উঁচু শিল্পমানসর্বস্ব আভাঁ গার্দ ও ইউরোপীয় আর্ট সিনেমা, যা দ্বিতীয় সিনেমার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম ও দ্বিতীয় সিনেমার বড় দূরত্বে থাকা তৃতীয় সিনেমার মাধ্যমে প্রকাশ ঘটে অপেক্ষাকৃত নিরীক্ষাধর্মী ও প্রতিবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শের। তবে তৃতীয় সিনেমা মানে যে শুধুই তৃতীয় বিশ্বের সিনেমা তাও কিন্তু নয়। এটি মূলত রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ (http://www.shilpaoshilpi.com/ তৃতীয়-সিনেমা-রাজনৈতিক-ও-স/)।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারার সূত্রপাত ধরে বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসের যে সংগ্রামী ও রাজনৈতিক ধারার সূত্রপাত হয়েছিলো তার প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি বদলে গেলেও এখনো তার গুরুত্ব ফুরিয়ে যায়নি। অন্যায়, শোষণ এবং সংঘাত নিজস্ব পূর্বকার চরিত্র বদলে যেমন দেশে দেশে অবস্থান করছে, তেমনি তৃতীয় চলচ্চিত্রের সেই পুরনো ধারণা ও মানসিকতা থেকে বেরিয়ে নির্মাতাদের নতুন রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের দীক্ষায় উন্নীত হতে হবে। আলোচ্য প্রবন্ধে, তাই তৃতীয় চলচ্চিত্রের আলোকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে, বাংলাদেশ তথা বর্তমান সময়ে তৃতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের সংকট ও সম্ভাবনার দিকটি উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট এখন বৈশ্বিক অবস্থার বাইরে নয়। নিয়ত গুম, হত্যা, গ্রেফতার, রাজনৈতিক খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড – আমাদের সাধারণ নাগরিক জীবনযাপনকে অস্থির ও অনিশ্চিত করে তুলছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিশ্রুত নিরাপত্তা প্রদানের বিপরীতে নিরাপত্তাহীনতা – নাগরিক মাত্রই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। আমাদের চলচ্চিত্রে এর আগেও আমরা সমাজ সচেতন, রাজনৈতিক বা প্রতিবাদী চলচ্চিত্রের কোন বিকাশ লক্ষ্য করিনি। কিন্তু লাতিন আমেরিকার দেশের মতো বাংলাদেশেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা কোন অংশে কম ছিল না। কিন্তু তৎকালীন বাস্তবতায় নির্মাতারা চলচ্চিত্রের নির্মাণ ব্যয়বহুলতা, অপর্যাপ্ত কারিগরি সুযোগ এবং প্রদর্শনের অভাবকে দায়ী করেছেন। কিন্তু এখন সেই অবস্থা নেই বললেই চলে। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি, ডিজিটাল প্রযুক্তি, সামাজিক মাধ্যম, মোবাইল নেটওয়ার্ক আকাশ সংস্কৃতিকে এমন হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে, যার প্রভাবে যে কোন পরিস্থিতিতে যে কেউই রাজনৈতিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসীর কাছে মতামত তুলে ধরতে পারেন – তা গল্প, কবিতা বা বক্তৃতার মাধ্যমে হোক কিংবা একটি যথাযথ সৃজনশীল চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্যে দিয়ে হোক। প্রয়োজন শুধু সৃষ্টিশীল মননে রাজনৈতিক সচেতনতা আর প্রতিবাদী মানসিকতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নাদির জুনাইদ তাঁর *'রাজনৈতিক চলচ্চিত্র'* প্রবন্ধে তৃতীয় চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে বলেন-

> "থার্ড সিনেমার প্রবক্তা আর্জেন্টিনার দুই চলচ্চিত্রকার ফার্নান্দো সোলানাস আর অক্টাভিও গেটিনোর মতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে সেসব সমস্যার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করা হয়ে ওঠে থার্ড সিনেমার মূল লক্ষ্য। থার্ড সিনেমা তাই সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান শাসনব্যবস্থা এবং স্ট্যাটাস কুও বিরোধী। সোলানাস ও গেটিনো উল্লেখ করেছেন যখন কোনো দেশের সরকার রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করার জন্য একটি চলচ্চিত্রকে মেনে নিতে পারবে না এবং চলচ্চিত্রটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে বুঝে নিতে হবে সেই চলচ্চিত্রটি বক্তব্যের মাধ্যমে বিদ্যমান ব্যবস্থাকে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে সেই চলচ্চিত্রটি হয়ে উঠেছে একটি থার্ড সিনেমা ধারার ছবি। থার্ড সিনেমার জন্য কোনো নির্দিষ্ট নির্মাণ শৈলীকে নির্ধারিত করা হয়নি। যেকোনো ধরনের নির্মাণ পদ্ধতির মাধ্যমেই থার্ড সিনেমা তৈরি হতে পারে। তবে থার্ড সিনেমার লক্ষ্য যেহেতু বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন করা নয় বরং রাজনৈতিক সমালোচনা প্রদান, ফলে থার্ড সিনেমায় যে ধরনের নির্মাণ শৈলীই ব্যবহার করা হোক না কেন, তা যেন রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ করে সেই দিকটি নিশ্চিত করা হয়। থার্ড সিনেমা বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের মূলনীতি প্রত্যাখ্যান করে সম্পূর্ণভাবে। তাই এই ধরনের ছবিতে নির্মাণ

শৈলী স্বাভাবিকভাবেই হয়ে ওঠে গতানুগতিকতা মুক্ত। মাইক ওয়েইনের মতে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে থার্ড সিনেমা ধারার ছবিই সবচেয়ে অগ্রসর আর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ছবি। সোলানাস আর গেটিনো থার্ড সিনেমাকে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হিসেবে বর্ণনা করে এই ধরনের চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত ক্যামেরাকে রূপক অর্থে তুলনা করেছেন বন্দুকের সাথে যে অস্ত্র প্রতি সেকেন্ডে ২৪টি ফ্রেম ছুঁড়তে পারে (https://www.ntvbd.com/arts-and-literature/23965/)।"

সুপারিশমালা: গবেষণার ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা

আলোচ্য গবেষণা কর্মের সীমাবদ্ধতা ও তার উত্তরণের দিক বিবেচনায় রেখে সুনির্দিষ্ট আলোকপাতের জন্য ভবিষ্যৎ গবেষণার বিষয় হিসেবে নিম্নো লিখিত নির্দেশনাসমূহ প্রদান করা হলো-

১. আধুনিক রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের বিকাশঃ তৃতীয় চলচ্চিত্র থেকে সমকালীন ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে হবে।

২. বাংলাদেশের রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে হবে।

৩. সমাজ বাস্তবতা উপস্থাপনে রাজনৈতিক ও প্রতিবাদী চলচ্চিত্রের ভূমিকাঃ পরিপ্রেক্ষিত পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশ প্রক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে হবে।

৪. সমকালীন রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের তৃতীয় ধারার প্রভাব ও বিস্তৃতির প্রক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে হবে।

৫. বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্র, মুক্ত চলচ্চিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে সমাজ ও রাজনীতির প্রভাব যাচাই করলে সঠিক মূল্যায়ণ সম্ভব।

৬. এছাড়া, সম্ভাব্য গবেষণার বিষয় হিসেবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সমূহের নানা চলচ্চিত্র আন্দোলন, প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর উপর রাজনৈতিক ও প্রতিবাদী ধারার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. অব্যয় রহমান; বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের ৫০ বছর (১৯৬১-২০১৩) http://vorerbd24.com/ 8937.

২. আহমেদ তেপান্তর, চলচ্চিত্রে সেন্সর নয় গ্রেডিং চাই, ঢাকা টাইমস, http://old.dhakatimes24.com/2013/12/09/7639/print .

৩. আহমেদ তেপান্তর, চলচ্চিত্রে সেন্সর নয় গ্রেডিং চাই, ঢাকা টাইমস, http://old.dhakatimes24.com/2013/12/09/7639/print .

৪. আলম, মাহবুব (১৯৮০) । বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে প্রতিবাদী সম্ভাবনা। মুহম্মদ খসরু ও অন্যান্য (সম্পাঃ) *ক্যামেরা যখন রাইফেল*। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফিল্ম বুলেটিনের বিশেষ সংকলন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদঃ ঢাকা।

৫. আনোয়ার, রফিকুল রাসেল (২০১৭)। স্মৃতি ও সিনেমার তারেক মাসুদ। অরবিন্দ চক্রবর্তী (সম্পাঃ) *মাদুলি* (বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পত্রিকা)। তারেক মাসুদ সংখ্যা। ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৫৩-১৫৪, ঢাকা।

৬. আনোয়ার, রফিকুল রাসেল (২০১৪)। সিনেমায় বিশ্বাস স্থাপন - আমাদের সময়ের চলচ্চিত্র নির্মাণ কথা। দেবাশীষ ধর (সম্পাঃ) *ঘুণপোকা* (শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক ছোট কাগজ)। ১ম সংখ্যা, চট্টগ্রাম।

৭. আহমাদ মাযহার ; মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র; ২৭ মার্চ ২০০৯; https://arts.bdnews24.com/?p=2263

৮. ইউসুফ আল মামুন - তৃতীয় সিনেমা : রাজনৈতিক ও সামাজিক জাগরণের হাতিয়ার http://www.shilpaoshilpi.com/তৃতীয-সিনেমা-রাজনৈতিক-ও-স/

৯. কবির, আলমগীর (২০১৮)। ভিসিআরের দৌরাত্ম্য ও মধ্যবিত্ত দর্শক (১৯৮১)। আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান ও প্রিয়ম প্রীতির পাল (সম্পাঃ) *চলচ্চিত্র ও জাতীয় মুক্তি: আলমগীর কবির রচনা সংগ্রহ ১*। আগামী প্রকাশনীঃ ঢাকা।

১০. কবির, আলমগীর (২০১৮) সংস্কৃতির সংকট ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র (১৯৭৩)। আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান ও প্রিয়ম প্রীতির পাল (সম্পাঃ) *চলচ্চিত্র ও জাতীয় মুক্তি: আলমগীর কবির রচনা সংগ্রহ ১।* আগামী প্রকাশনীঃ ঢাকা।

১১. খসরু, মুহম্মদ (১৯৮০)। অগ্নিগর্ভের ছবি। মুহম্মদ খসরু ও অন্যান্য (সম্পাঃ) *ক্যামেরা যখন রাইফেল*। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফিল্ম বুলেটিনের বিশেষ সংকলন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদঃ ঢাকা।

১২. গেটিনো, অক্টাভিও ; সোলানাস, ফারনান্দো (১৯৬৯)। তৃতীয় চলচ্চিত্রের লক্ষ্যে, কাইজার চৌধুরী অনূদিত মুহম্মদ খসরু (সম্পাঃ) *ধ্রুপদী (নির্মল চলচ্চিত্র আন্দোলনের মুখপাত্র)*। ৫ম সংকলন, আগস্ট, ১৯৮৫, ঢাকা।

১৩. চলচ্চিত্রের সাম্প্রতিক ধারা: বাংলা চলচ্চিত্রে ''থার্ড'' বা ''তৃতীয়'' সিনেমা, সিনেমাতাল; একটি চলচ্চিত্র বিষয়ক ব্লগ, https://moniramoni.wordpress.com/চলচ্চিত্রের-সাম্প্রতিক-ধ/

১৪. ড. জুনাইদ, নাদির ; রাজনৈতিক সচেতনতা ও বাংলাদেশি চলচ্চিত্র ২০১৫, বিডিনিউজ২৪ (অনলাইন ভার্সন) https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/28717.

১৫. ড. নাদির জুনাইদঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক চলচ্চিত্র ২ ; পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্রে রাজনৈতিক অভিপ্রায়, ১৪ অক্টোবর ২০১৫, এনটিভিবিডি অনলাইন। https://www.ntvbd.com/arts-and-literature/24083/.

১৬. ড. নাদির জুনাইদ ; আবার তোরা মানুষ হ' কোন ধরনের চলচ্চিত্র?
নীড়পাতা, সচলায়তন ব্লগ ১৯/১০/২০১৭
http://www.sachalazatan.com/naadir_junaid/56801.

১৭. নাদির, ড. জুনাইদ (২০১৭)। জনপ্রিয়, শৈল্পিক এবং রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের দ্বান্দিকতা; সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী'র ঘুড্ডি (১৯৮০)। ড. নাদির জুনাইদ (সম্পা:) *প্রতিবাদের নান্দনিকতাঃ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে প্রথা বিরোধী চলচ্চিত্র*। জনান্তিক: ঢাকা।

১৮. তারেক আহমেদ, নদীর দেশের চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির ২০ জানুয়ারি ২০১৬ ; https://arts.bdnews24.com/?p=7311

১৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
https://bn.wikipedia.org/s/93l.

২০. মাসুদ, তারেক (২০০৭) ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রাসঙ্গিকতা: পরিপ্রেক্ষিত
বাংলাদেশ। ফাহমিদুল হক ও আ-আল মামুন (সম্পা*:) যোগাযোগ পত্রিকা*,
সংখ্যা ৮ (ফেব্রুয়ারি), ঢাকা।
http://www.somewhereinblog.net/blog/fahmidulhaqblog/28779161.

২১. মজুমদার, প্রেমেন্দ্র (২০১৪)। সিনেমার রাজনীতি, রাজনৈতিক সিনেমা। অনিন্দ্য গুহ ও অন্যান্য (সম্পা:) *সংবর্তক* (সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক পত্রিকা)। ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা জানুয়ারি, কলকাতা, ভারত।

২২. যুলকারনাইন; জহির রায়হানঃ বাংলাদেশে তৃতীয় ধারার চলচ্চিত্রের বংশীবাদক- ২৭ শে মে, ২০১৩ http://www.somewhereinblog.net/blog/julqernine92/29835087.

২৩. রায়হান, জহির (১৯৮০)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র। মুহম্মদ খসরু ও অন্যান্য (সম্পা:) *ক্যামেরা যখন রাইফেল*। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফিল্ম বুলেটিনের বিশেষ সংকলন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ: ঢাকা।

২৪. সাজেদুল আউয়াল ; চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর : অর্জন ও অতৃপ্তি http://www.kaliokalam.com//চলচ্চিত্র-সংসদ-আন্দোলনের/.

২৫. Samira Makhmalbaf (2000) "The Digital Revolution and the Future of Cinema" , https://www.wsws.org/en/articles/2000/06/makh-j28.html

২৬. Wimmer, D, Roger & Dominick R. Joseph (2003), *Mass Media Research: An Introduction ,* Thomson Wadsworth Publishing Company, Singapore.

২৭. https://www.goodreads.com/quotes/26464-the-most-terrifzing-fact-about-the-universe-is-not-that.

২৮. ttps://www.brainzquote.com/quotes/jean_cocteau_385705.

২৯. https://www.goodreads.com/quotes/1207436-to-educate-the-masses-politicallz-does-not-mean-cannot-mean.

৩০. Getino, Octavio; Solanas, Fernando (1969). "Hacia un Tercer Cine (Toward a Third Cinema)" Tricontinental.

৩১. Espinosa, Julio García, translated by Julianne Burton ; For an imperfect cinema, from *Jump Cut,* no. 20, 1979, pp. 24-26 copyright *Jump Cut: A Review of Contemporary Media*, 2005 (http://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC20folder/ImperfectCinema.html).

৩২. https://ufsinfronteradotcom.files.wordpress.com/2011/05/tercer-cine-getino-solonas- 19691.pdf.

৩৩. http://documentarzisneverneutral.com/words/camasgun.html

৩৪. On Third Cinema https://www.zoutube.com/watch?v=KfxzDBWh6E8

৩৫. Interview with Octavio Getino about Third Cinema filmed in Mexico in 1982, excerpted from 'New Cinema of Latin America', dir. Michael Chanan. (https://www.zoutube.com/watch?v=CVohdIUNuGk&t=73s).

৩৬. http://www.criticalcommons.org/Members/kkeeling/clips/Third%20Cinema%20and%20the%20Promise%20of%20Digital%20Media.m4v/view.

৩৭. http://kinoglazonline.weeblz.com/fernando-solanas.html.

৩৮. http://www.thirdcinema.blueskzlimit.com/.

৩৯. http://www.mchanan.com/latin-america.

৪০. Political Filmmaking, Collaboration, and Digital Technologies: Rorz Padgett at TEDxFAU(https://www.zoutube.com/watch?v=Cq3Az0n4LAM).

৪১. https://www.ntvbd.com/arts-and-literature/23965/

[**Abstract:** Holding this spirit in mind, in 1969 Argentine film maker Fernando Solanas and Octivio Setino pulished an article titled as 'toward a third cinema' in Tricontinental which was a mouthpiece of OSPAAL's Grupo Cine Liberacion. In this article the concept of third film was first clearly spelled out. It was expected that third cinemas would build new and protesting texts in cinema with an aim to create an oppression free society and a new social reality. The pioneers of third cinema named the profit mongering Hollywood movies as 'first cinema', the author based elitist intellectual movies of Europe as 'second cinema' and the revolutionary and political movies of the third world as 'third cinema'. By the course of time artists, film makers, technical support hands of Latin America, Africa and many other third world countries of Asia adopted the article 'Toward a third cinema' as a revolutionary and political manifesto for making third cinema. In order to show the world, the massacre, mass killings, rapes, atrocities committed by the Pakistani army, Bangladeshi filmmakers dedicated themselves in making cinemas following the footsteps of third cinema. Afterwards, young filmmakers in protest of the autocratic rule of the 80's started film movement by prioritizing ordinary people's lives, politics and struggles in their movies. During

those times these films, made in the legacy of third cinema, facilitated a political atmosphere for the people to show their support for democratic process over military autocratic rule. The present paper, with adequate research, attempts to analyze and present the historical context of the efforts, limitations, crisis and potentials of making short films and liberating films in Bangladesh in light of the revolutionary tradition of third cinema.]